শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ,
স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতির অপ্রকাশিত
কথোপকথন ও পত্রাবলী

সংগ্রাহক ও সম্পাদক

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বেলুড় মঠ

বিশ্বমাতা মন্দির

দক্ষিণেশ্বর, চব্বিশ পরগণা

প্রকাশিকা—
শ্রীনীরবালা মিত্র
সেবাইত—বিশ্বমাতা মন্দির
'গুরুধাম', দক্ষিণেশ্বর
পোঃ—আরিয়াদহ, চব্বিশ পরগণা
কলিকাতার ঠিকানা—১২বি, নারিকেল বাগান লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৮—১২০০
মূল্য দুই টাকা চার আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
৩। জে. সি. ব্যানার্জ্জি, ৫৪।৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
৪। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা—৯

নিবেদন

আধুনিক ধর্মসাহিত্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার পার্ষদগণের পূত জীবনী ও কথামৃত উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সম্বন্ধে বাংলায়, হিন্দিতে, গুজরাটীতে, তামিলে ও তেলেগুতে এবং ইংরাজি, ফরাসী প্রভৃতি অনেক স্বদেশী ও বিদেশী ভাষায় বিশাল সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের লীলাসহচরগণের সম্বন্ধে যাহা এই পুস্তকে প্রদত্ত তাহা অদ্যাবধি কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের জীবনের কয়েকটী ক্ষুদ্র ঘটনা ও কথোপকথন এই পুস্তকে সংগৃহীত। মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণী এমন অলৌকিক যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং ছোট ছোট কথায় ও তাঁহাদের মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠে। এক কণা চিনি মুখে দিলেই বুঝা যায়, চিনি কত সুমিষ্ট; বিন্দুমাত্র অমৃত পান করিলেই মধুর আস্বাদে মুখ ভরিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, গঙ্গা স্পর্শ করিতে হইলে যে কোন স্থানে উহা স্পর্শ করিলেই হয়, হরিদ্বার হইতে সাগর পর্যন্ত গঙ্গা স্পর্শ করিতে হয় না। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে বর্তমান সংগ্রহের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। এই প্রকার পুস্তকের সংখ্যা ইংরাজি ভাষায় ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বিস্তৃত জীবনী ইতঃপূর্বে মৎপ্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী তুরীয়ানন্দের মল্লিখিত বিস্তৃত জীবনী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যের জীবনী মৎপ্রণীত 'নবযুগের মহাপুরুষ' পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ। স্বামী প্রেমানন্দ নিত্যসিদ্ধ

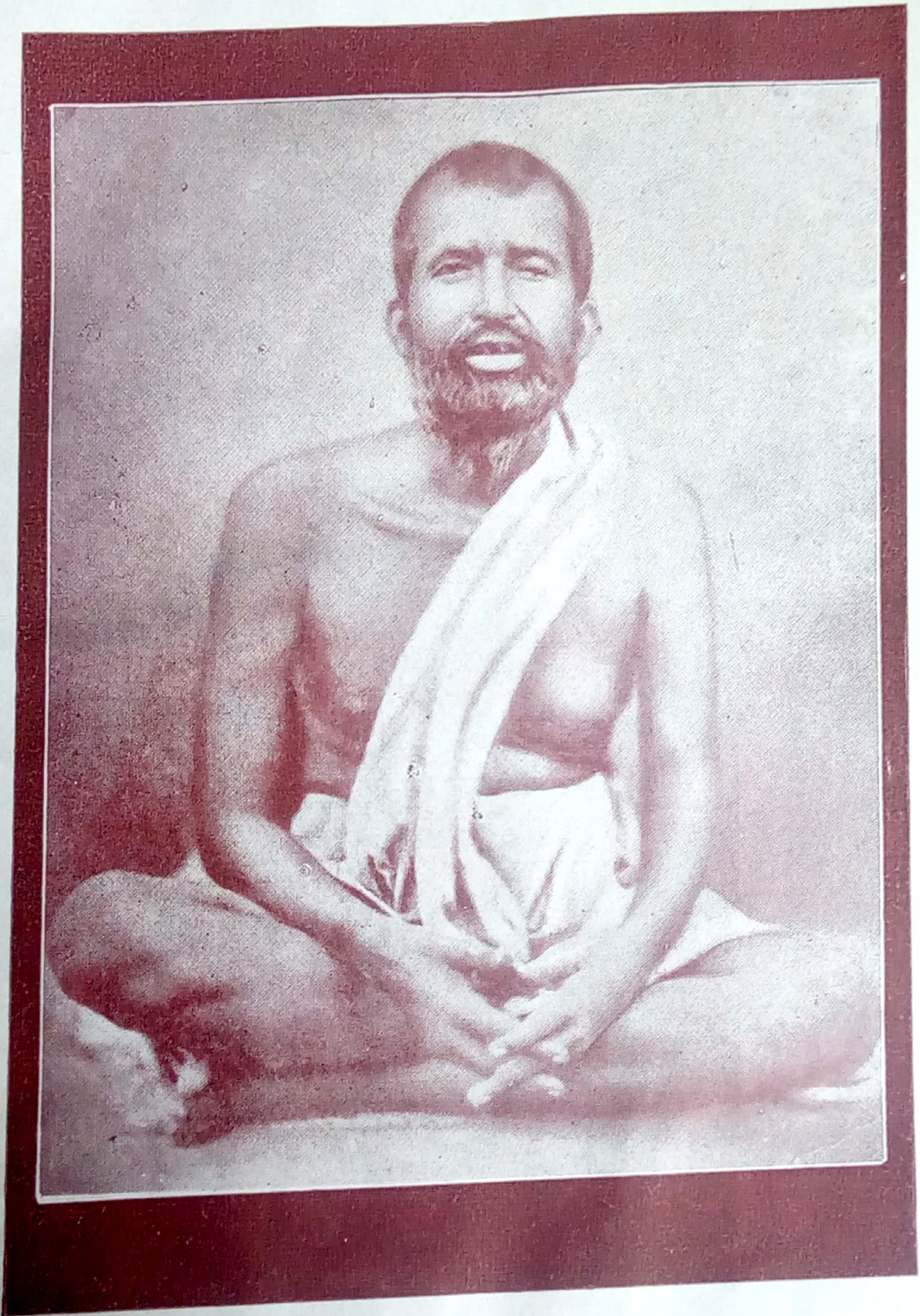
ঈশ্বরকোটী মহাপুরুষ। ঠাকুর বলিতেন, শ্রীরাধার অংশে তাঁহার জন্ম। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন যথাক্রমে বেলুড় মঠের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যক্ষ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন ঠাকুরের অতি একনিষ্ঠ সেবক এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁহার বার্তাবহ। স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন অতুল ত্যাগী তপস্বী সন্ন্যাসী। তিনি তিন বৎসর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি কালিফোর্ণিয়ার পাহাড়ে যে শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান।

স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের যে উপদেশ এই পুস্তকে প্রকাশিত তাহা ঢাকার স্বর্গগত ভক্তবর প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক স্বকর্ণে শ্রুত এবং স্বহস্তে লিখিত। অন্যান্য অংশ যাঁহাদের দ্বারা সংগৃহীত বা সংকলিত তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র 'উদ্বোধন' মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার সংগ্রহণ ও সংকলন কার্যে আমার প্রধান সহকারী ছিল পুত্রাধিক স্নেহাস্পদ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি. এ. এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাদের অক্লান্ত ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ব্যতীত বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া এই পুস্তক সম্পাদন ও সংশোধন আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। ইহার সমগ্র উপস্বত্ব দক্ষিণেশ্বর গুরুধামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমাতা দেবীর সেবায় উৎসর্গীকৃত। এই পুস্তকের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মহিমা কিঞ্চিৎ প্রচারিত হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণম্ অস্তু। অলমিতি।

বেলুড় মঠ
শ্রীপঞ্চমী, মাঘ
১৩৫৭

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সূচী



শ্রীরামকৃষ্ণদেব

ওঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ

এক

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত *

সরল ভাষায় বুঝাইতে, সরল কথায় শিক্ষা দিতে
জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ আর সুধামাখা বাণী।
(এমন) কে শুনেছে, কোথায় আছে বল দেখি শুনি॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু॥
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু॥ ১॥

কামিনীকাঞ্চন ত্যজ, মিছে কেন ভ্রমে মজ
এই কথা সার করে বলে গেছেন তিনি।
(আবার) তাঁরি নাম-সংকীর্তনে মাতুক মেদিনী॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু॥
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরাগকৃষ্ণ প্রভু॥ ২॥

---

* বেলুড় মঠের স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ কর্তৃক ১৯২৬ খ্রীঃ তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে রচিত এবং ১৯৫০ খ্রীঃ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা..." গানের সুরে ইহা গীত হয়। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ বহু বৎসর আমেরিকায় চিকাগো সহরে বেদান্ত প্রচারান্তে তথায় দেহরক্ষা করিয়াছেন।

সাংখ্যাদি বেদবেদান্ত-দর্শনে যাঁর নাইক অন্ত
কোরাণ বাইবেল সবই মাত্র একই, ভিন্ন নয়।
কে করেছে এমন সর্ব ধর্ম সমন্বয় ॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥ ৩ ॥

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
আশীষ দাও পরমহংস সেবক সন্তানে।
(মোদের) সদাই যেন থাকে মতি তোমার শ্রীচরণে ॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥ ৪ ॥

দুই

বিবিধ

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বার্ধক্যেও শিবরাত্রির উপবাস করিতেন। তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি বৃদ্ধ বয়সেও উপবাস করেন কেন? উত্তর হইল—কিছু পাই। প্রশ্ন—কি পান? উত্তর—দর্শনাদি। প্রশ্ন—কার, শিবের না ঠাকুরের? উত্তর—ঠাকুরের দর্শন পাই। প্রশ্ন—শুধু দর্শন, না কথাবার্তাও হয়? উত্তর—সেইটিই

জীবনের শেষ আশা। এই সকল কথা বলিবার সময় গিরিশ বাবুর চোখ মুখ ভাবাতিশয্যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল।[১]

* * * *

১৯২০ খ্রীঃ জুলাই মাসে ভুবনেশ্বর মঠে অবস্থানকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন নিশীথে উঠিয়া সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কটা বেজেছে? সেবক—একটা কুড়ি মিনিট। তখন মহারাজ বলিলেন, "অনেক দিন শ্রীশ্রীমায়ের খবর পাই নি। একটা দুঃস্বপ্ন দেখলুম। মনটা খুব খারাপ হয়েছে। এক ছিলিম তামাক সাজ।" তিনি দুঃস্বপ্নের কথা আর কিছু বলিলেন না। পরদিন প্রাতে বেলুড় মঠ হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল, শ্রীশ্রীমা পূর্বরাত্রে সেই সময়েই মহাসমাধিস্থা হইয়াছেন। তাই মহারাজ উক্ত সময়েই শ্রীমার মহাসমাধির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার শরীর বেলুড় মঠে ভস্মীভূত করা হয়। ভক্ত পঞ্চানন বাবু তখন শ্রীমায়ের একটু অস্থি লইয়া স্বগৃহে রাখেন এবং কিরূপে উহার পূজাদি করিবেন সেই সম্বন্ধে রাজা মহারাজকে পত্র দেন। মহারাজ তখন বাঙ্গালোরেই ছিলেন। তিনি পঞ্চানন বাবুর পত্র পাঠান্তে উত্তর দিলেন, "আপনি অবিলম্বে মায়ের অস্থি বেলুড় মঠে ফেরৎ দিয়ে আসুন। সাধুব্রহ্মচারী দ্বারা উহার পূজা করাইতে না পারিলে অকল্যাণ হইবে। অন্য কেহ পূজা করিলে সর্বনাশ হইতে পারে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণ শ্রীশ্রীমাকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই ঘটনা হইতে সহজেই অনুমেয়।

* * * *

স্বামীজীর জীবৎকালেও বাবুরাম মহারাজ মঠে ঠাকুরপূজা করিতেন। তখন পুরাতন ঠাকুরঘরেই পূজা হইত। বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপাত্র ও

---

১ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক লিখিত এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৫৭ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

কোশাকুশি প্রভৃতি সাজাইয়া ঠাকুরঘরে পূজার আসনে বসিয়াছেন। তখন বেলা আন্দাজ নয়টা হইবে। স্বামীজী ঠাকুরঘরে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে পূজার আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "বাবুরাম দা, যাও ত পাড়ার গরীবদুঃখীদের সেবা কর। ফুলচন্দন দিয়ে ত এতদিন পূজো করলে; এখন সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণের সেবা কর।" এই বলিয়া স্বামিজী স্বশিষ্য ব্রহ্মচারী নন্দলালকে ঠাকুরপূজা করিবার আদেশ দিলেন। বাবুরাম মহারাজ দলপতির নির্দেশ অমান্য করিতে না পারিয়া বেলুড় গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া গরীবদুঃখীদের সন্ধান করিলেন। কোন পর্ণকুটিরে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা বিধবাকে দেখিয়া তাঁহার সুখদুঃখের কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে অসুখ হইলে মঠের চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ লইতে বলিলেন। বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গতর থাকতে তোমাদের খয়রাত কেন নেবো গো?" বাবুরাম মহারাজ অন্য পাড়ায় যাইয়া কয়েকটি গরীব ছেলেমেয়েকে ধরিয়া মঠে আনিলেন এবং তাহাদের মলিন দেহ সাবান দ্বারা ধোয়াইয়া, তেল মাখাইয়া, স্নানান্তে নূতন কাপড় পরাইয়া তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইলেন। স্বামীজী দ্বিতল হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুরাম দা, কেমন লাগছে? বাবুরাম মহারাজ প্রসন্ন বদনে বলিলেন, যখন এদের সেবা কচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ ঠাকুরের, জীবন্ত নারায়ণের সেবা কচ্ছি।[২]

বাগবাজার বসুপাড়া গলিতে স্বামী সদানন্দ যখন অন্তিম শয়নে শায়িত, তখন শ্রীমা তাঁহাকে একবার দেখিতে আসেন। মা গুপ্ত মহারাজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। তখন গুপ্ত মহারাজ তাঁহাকে করজোড়ে কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "মা, বাইশ বৎসর পূর্বে যখন জয়রামবাটীতে গিয়েছিলাম তখন আপনি আমার মাথায় পা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাতেই বাইশ বছর মহানন্দে গুজ্‌রান হল। আর একটি বার আমার মাথায় পা

২ স্বামী হরিহরানন্দজী কথিত।

দিয়ে আশীর্বাদ করুন মা, যাতে হাসতে হাসতে ভবসাগর-পারে চলে যেতে পারি।" মুমূর্ষু সন্তানের সকরুণ প্রার্থনায় মাতৃহৃদয় দ্রবীভূত হইল। বহুমূত্র রোগে দীর্ঘকাল আক্রান্ত হওয়ায় গুপ্ত মহারাজের ঘাড় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি ঘাড় নোয়াইয়া মাতৃচরণে প্রণত হইতে পারিলেন না। তখন শ্রীমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সন্তানের মস্তকে স্বীয় দিব্যপদ স্থাপন করিয়া ভাবস্থা হইলেন। এই ঘটনার দুই এক মাস পরেই গুপ্ত মহারাজ দেহরক্ষা করেন।

আমেরিকার ভক্তগণ বলিয়াছিলেন, **Swamiji was like the dazzling sun, but Sarat Maharaj was like the soothing moon.** অর্থাৎ স্বামীজী ছিলেন অত্যুজ্জ্বল সূর্য, যার আলোকে চোখ ঝলসে যায়; আর শরৎ মহারাজ ছিলেন স্নিগ্ধ কিরণশালী চন্দ্রতুল্য। ৩

বিজ্ঞান মহারাজ যখন কলেজে পড়িতেন তখন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে একবার গিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাদুর পাতিয়া মেজেতে বসিতে বলিলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে? তখন গুরুকৃপায় শিষ্য দেখিলেন, তাঁহার হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ময় রামকৃষ্ণ-মূর্তি। পরে ঠাকুর বলিলেন, তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও। তখন বিজ্ঞান মহারাজ দেখিলেন, সম্মুখে ঠাকুর নাই, কেবল মাত্র ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের জ্যোতির্ময় আকার। আর অন্তরে দর্শন করিলেন, অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্র, কোন রূপ নাই। বিজ্ঞান মহারাজ বলিতেন, ঠাকুরের বাক্য শ্রবণেই অনেকের অলৌকিক অনুভূতি লাভ হইত।

ভুবনেশ্বর মঠে রাজা মহারাজ একদিন সুরেন বাবুকে (নির্বেদ মহারাজকে) বলিয়াছিলেন, এইখানে একটা **university** (বিশ্ববিদ্যালয়) করুন। মহারাজ স্বীয় অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক যে স্থলে বিশ্ববিদ্যালয় করিবার

---

৩ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী কথিত।

জন্য সুরেন বাবুকে বলিয়াছিলেন সে স্থলেই উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে। সিদ্ধ মহাপুরুষের শুদ্ধ মনে ভবিষ্যতের চিত্র ভাসিয়া উঠে।

১৯১১ খ্রীঃ শ্রীশ্রীমা কাশীধামে কিরণচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ স্থানীয় অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন। তাঁহারা একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আহার করিতে যান। নীচের হলঘরে তাঁহারা খাইতে বসিয়াছেন। মধ্যস্থলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং তাঁহার বাম ও ডান পার্শ্বে যথাক্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উপবিষ্ট। বাঁকুড়ার কোন ভক্ত তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভক্তপত্নী প্রণাম করিতে আসিলে ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ভক্ত-পত্নী লজ্জাবশতঃ উত্তর দিতে দ্বিধা করিতেছেন দেখিয়া রাজা মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "লজ্জা কি মা ? আমি তোমার পিতা। পিতার কাছে কথা বলতে লজ্জা কি ? আমি তোমার বাপ, ইনি (শিবানন্দজী) তোমার জ্যাঠা, আর ইনি (তুরীয়ানন্দজী) তোমার কাকা।" হরি মহারাজ ও মহাপুরুষের দিকে পর পর মুখ ফিরাইয়া তিনি ভক্ত-পত্নীকে আবার বলিলেন, "দেখছ না ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসে আছেন।" তখন ভক্ত-পত্নী নিজের নামটি বলিতে সাহস পাইলেন।

* * * *

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে এক বৎসর বিজয়া দশমীর দিন মঠের দুর্গাপ্রতিমা পূজার তন্ত্রধারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়ের বিসর্জন কোথায় হবে ? তন্ত্রধারক—কেন ? গঙ্গায়, যেমন বৎসর বৎসর হয়। বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন—"না না, হৃদয়ে মাকে বিসর্জন দিতে হয়। হৃদয়ে মায়ের নিত্যাধিষ্ঠান। হৃদয়স্থ দেবতাকে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত করে পূজা হয়েছিল। পূজান্তে তাঁকে আবার হৃদয়ে রাখতে হবে।"

* * * *

১৯১৭ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন পুরীধামে ছিলেন তখন রাজা মহারাজও তথায় ছিলেন। একদিন রাজা মহারাজ আহারান্তে তাড়াতাড়ি উঠিয়া খালি পায়ে মুখ ধুইতে গেলেন নবরোপিত একটি চারা গাছের গোড়ায়। তখন খুব রৌদ্র ছিল। খালি পায়ে চলিলে বা রৌদ্র লাগিলে তাঁহার কষ্ট হইবে ভাবিয়া হরি মহারাজ তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া শীঘ্র হাত-মুখ ধুইয়া জ্যেষ্ঠ গুরু-ভ্রাতার জুতা ও ছাতা হাতে লইয়া যাইয়া রাজা মহারাজের মাথায় ছাতা ধরিয়া জুতা জোড়াটি পায়ে দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা মহারাজ বলিলেন, হরি ভাই, করেন কি? হরি মহারাজ তখন শ্রদ্ধাপ্রীতিপূর্ণ বাক্যে উত্তর দিলেন, খালি পায়ে ও খালি মাথায় আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে যে! এমনি গভীর ছিল ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের গুরুভ্রাতৃ-ভক্তি!

সুরেন বাবু (স্বামী নির্বেদানন্দজী) বেলুড় মঠে যোগদানের সংকল্প করেন। কিন্তু অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহার যে ঋণ হইয়াছিল তাহা শোধ করিবার জন্য তাঁহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। এদিকে মহাপুরুষজী নির্বেদ মহারাজকে বৈদিক ঋষিকুলের আদর্শে ছাত্রাবাস স্থাপনের আদেশ দিয়া বলেন, স্বামীজীর সংকল্পিত এই কাজটি তুমি আরম্ভ কর। নির্বেদ মহারাজ অনতিবিলম্বে মহাপুরুষজীর আদেশ পালন করেন। বাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণান্তে ফিরিয়া স্বামী নির্বেদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, ঋণশোধ হয়েছে? কবে মঠে যোগ দেবে?" নির্বেদ মহারাজ উত্তর দিলেন—হাঁ মহারাজ, ঋণশোধ হয়েছে এবং মহাপুরুষজীর আদেশে কলিকাতায় একটী ছাত্রাবাস স্থাপন করেছি। ইহা শুনিয়া প্রেমানন্দজী সানন্দে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, তা বেশ, মহাপুরুষজীর আদেশ দৈববাণী জানবে।[৪]

* * * *

বাবুরাম মহারাজ একদিন কোন গরীব লোককে মঠের বাগানে উৎপন্ন

৪ স্বামী নির্বেদানন্দজী কথিত।

কিছু শাকসব্জি ও একটি লাউ দান করেন। রাজা মহারাজ তাহা দেখিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, "মঠের জিনিষ ঠাকুরের ভোগে লাগবে, ওকে দিলে কেন?" ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রেমানন্দজী মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি বুজানো পুকুরের ধার দিয়া পুরাণ ফটক পর্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর দিব্য দেহে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার গলায় গামছা দিয়া বলিলেন, যাবে কোথায় যাদু? বাবুরাম মহারাজ আর যাইতে পারিলেন না। তিনি মঠে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মানন্দজীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ এইরূপে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইতেন।

* * * *

১৯২৭ খ্রীঃ স্বামী শিবানন্দ শেষবার কাশীতে ছিলেন। তিনি প্রথমে সেবাশ্রমে উঠেন, কিন্তু পরে অদ্বৈতাশ্রমে আসেন। তাঁহার শুভ জন্মদিনে অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্রবাবা তাঁহাকে রেশমী কাপড় ও চাদর উপহার দেন এবং ভাল গড়ে-মালা আনাইলেন তাঁহার গলায় পরাইবার জন্য। অদ্বৈতাশ্রমে দোতলার বারান্দায় ঐ কাপড় পরিয়া আসিয়া মহাপুরুষজী দাঁড়াইলেন এবং নিম্নে দুর্গামণ্ডপে অবস্থিত চন্দ্রবাবাকে দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, জয় চন্দ্রবাবার জয়! জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়! এমন সময় বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদী গড়ে-মালা আনিয়া তাঁহাকে পরান হইল। ইহাতে তিনি ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। কাশীতে পৌষের তীব্র শীতেও তাঁহার দেহ ভাবাবেগে ঘর্মাক্ত হইল। ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি পার্শ্বস্থ সন্ন্যাসী সেবকগণকে বার বার বলিতে লাগিলেন, "তোরা মুক্ত হয়ে যা। তোরা মুক্ত হয়ে যা।" সেইবার কাশীতে অবস্থান-কালে চন্দ্রগ্রহণের পরদিন প্রাতে সেবাশ্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গাস্নানান্তে প্রত্যাগত সাধুগণকে দেখিয়া মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন," গঙ্গাস্নানে তোদের সব পাপ ধুয়ে গেল, তোরা পাপমুক্ত হয়ে গেলি।" জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের একমাত্র

কর্ম থাকে অন্যের কল্যাণকামনা। গীতার মতে তাঁহারা সর্বভূতহিতে রত থাকেন।[৫]

* * * *

১৯০৮ খ্রীঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাঙ্গালোরে যান শশী মহারাজের সহিত। তাঁহার সেবক স্বামী উমানন্দ তথায় দৈবাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল চিকিৎসার্থ। শশী মহারাজ রোজ হাসপাতালে যাইয়া রোগীকে দেখিয়া আসিতেন। উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষাসত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তারেরা আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিলেন। রোগীও তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন শশী মহারাজকে করজোড়ে মিনতি করিলেন, "আমি ত আর বাঁচবো না। একটি বার মহারাজকে শেষ দেখা দেখতে চাই। তাঁকে হাসপাতালে আসতে দেব না। তিনি রাস্তায় গাড়ীতে বসে থাকবেন। আমি জানালার মধ্য দিয়ে তাঁকে দর্শন করে প্রাণ জুড়াব।" শশী মহারাজ মুমূর্ষু রোগীর কাতর প্রার্থনা ব্রহ্মানন্দজীকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নয়। আমি রোগীকে দেখতে গিয়ে সংক্রামক রোগে পড়ব নাকি?" তিনি রোগীকে দেখিতে গেলেন না। শশী মহারাজ রোগীকে সান্ত্বনা দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইল। ইহাতে শশী মহারাজ মর্মাহত হইলেন। তিনি গম্ভীর আননে আসিয়া ব্রহ্মানন্দজীকে উমানন্দের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দুই একদিন পরে তিনি মর্মবেদনা চাপিতে না পারিয়া ব্রহ্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সেবকের প্রতি এত নিষ্ঠুর হলেন কেন মহারাজ? তখন ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, "শশী, তুমি কি মনে কর চোখের দেখাই একমাত্র দেখা? তার জন্য আমার প্রাণ কেমন করেছিল তা কি তুমি জান? আর সে যে আমার দেখা পায় নি তাও

---

৫ স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দজী কথিত।

বা তুমি কি করে জানলে ?" শশী মহারাজ বুঝিলেন, ঈশ্বরকোটি গুরু শিষ্যকে শেষ সময়ে সূক্ষ্ম দেহে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন।[৬]

* * *

স্বামীজী বিবেকানন্দ যখন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত তখন গুপ্ত মহারাজ কিছুদিন তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। গুরুসেবার জন্য শিষ্য-সেবককে সারারাত্রি জাগিতে হইত। একদিন রাত্রে স্বামীজী ঘুমের ঘোরে প্রস্রাবের বেগবশতঃ হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করিতে ছিলেন। সেবক তৎক্ষণাৎ মূত্রপাত্রলইয়া গুরুকে দিলেন। গুরু এইরূপে রাত্রিতে বহুবার মূত্রত্যাগ করিতেন। শিষ্যের প্রতি গুরুরও ছিল অসীম স্নেহ। গুরুসেবার জন্য রাত্রিজাগরণ হেতু শিষ্য পরদিন প্রাতে বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়েন। ইতোমধ্যে রৌদ্র আসিয়া শিষ্যের মাথায় পড়িল। গুরু তাহা দেখিয়া নিজের ছাতাটি খুলিয়া শিষ্যের মাথায় ধরিলেন, পাছে শিষ্যের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

গুপ্ত মহারাজের সেবাপরায়ণতা ছিল অসাধারণ। কলিকাতায় যে বৎসর প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়, সেই বৎসর স্বামীজীর নির্দেশে তাঁহার শিষ্যগণ সেবাকার্যে ব্রতী হন। যে পল্লীতে গুপ্ত মহারাজ সেবা করিতেন, তথায় একটি প্লেগ রোগী জ্বরের অত্যধিক উত্তাপে ছটফট করিতেছিল। রোগীটিকে বুকে করিয়া সন্ন্যাসী সেবক রাত্রি কাটাইলেন। রোগীর মুখের লালা সেবকের বুকে গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার শরীরে রোগ সংক্রমিত হইল না। ইহা শুনিয়া গিরিশ বাবু গুপ্ত মহারাজকে বলিয়াছিলেন, তোর দেহ ঠাকুরের।

* * *

হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রামে ঠাকুরের পরম ভক্ত নবগোপাল ঘোষ বাস করিতেন। স্বামীজী তাঁহাদের পূজা-ঘরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শুভ মুহূর্তে তৎকর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্র রচিত

---

৬ স্বামী শিবেশানন্দজী কথিত।

হয়। নবগোপাল বাবুর সহধর্মিনী পরম ভক্তিমতী ও অশেষ গুণশালিনী ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি পরিণীতা হন। পরিণয়ের অল্পকাল পরে তিনি তাঁহার পতির সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। একবার তিনি ঠাকুরের কাছে যান : তখন ঠাকুরের খাটের নীচে একটি বিড়াল কয়েকটি সদ্যপ্রসূত বাচ্চা লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওরা এসে এখুনি বেড়ালের বাচ্চাগুলোকে মেরে তাড়াবে। কিন্তু আশ্রিতকে কি করে রক্ষা করা যায় ?" তখন স্ত্রীভক্তটি বলিলেন, আমি এগুলি নিয়ে যেতে পারি। উক্ত প্রস্তাবে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, "তুমি আমাকে একটা দায়িত্ব থেকে বাঁচালে। মায়ের কৃপায় তোমার মঙ্গল হোক, ইষ্টদর্শন হোক।" ঠাকুর বলিতেন, "এই স্ত্রীভক্ত উচ্চাধিকারিণী। ওর ছিন্নমস্তার অংশে জন্ম।" ছিন্নমস্তা-দর্শনের পর তিনি প্রায় ছয় মাস উক্ত ভাবে অভিভূতা ছিলেন। সেই সময় ভাবে তাঁহার মুখচোখ লাল হইয়া থাকিত এবং তাঁহার গৌরী মূর্তিটিকে ছিন্নমস্তার মত দেখাইত। বেলুড় মঠের সাধুব্রহ্মচারিগণ যাইয়া তখন তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন রাম। তিনি ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। তিনি আবির্ভূত ইষ্টদেবকে প্রণামপূর্বক পায়ের ধূলা লইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, ইষ্টমূর্তির পরিবর্তে গুরুমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, কি, এখন বিশ্বাস হল, আমি কে ? ১

একদা স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠের পুরাণ ঠাকুর-ঘরে প্রাতঃকালীন জপধ্যান করিয়া উঠিলেন। অন্য দুই জন সন্ন্যাসীও তখন তথায় ছিলেন। ভাবাবিষ্ট প্রেমানন্দজীর বাহ্য জ্ঞান আসিতেছিল না। জপের মালাটী হাত হইতে পড়িয়া গেল। অতিকষ্টে দাঁড়াইলেন, কিন্তু পা দুইটী টলিতে ছিল, দিগ্‌ভ্রমও হইতেছিল। অন্য সাধুদ্বয় তাঁহাকে ধরিয়া নীচে

---

১ স্বামী বাসুদেবানন্দ কথিত।

আনিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁহার ভাবাবেশ প্রশমিত হইল। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর-কোটীর নিত্য ধ্যানে ভাবসমাধি হইত। আর একদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরের পূজক ব্রহ্মচারী ধ্যানস্থ প্রেমানন্দজীকে বহুবার চীৎকার করিয়া এবং তাঁহার চোখের সামনে লণ্ঠনালোক ধরিয়াও সাড়া পান নাই। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহার সংজ্ঞা হইল তখন উক্ত ব্রহ্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?" প্রেমানন্দজী তদুত্তরে এই গানটী গাহিলেন—

"ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥"

মহাসমাধির কয়েক দিন পূর্বে প্রেমানন্দজী স্বীয় দিব্য স্বরূপে সদা আরূঢ় থাকিতেন। তখন একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "দুধের মত সাদা ধবধবে চালের ভাত খাবো এবং চাঁপা ফুলের রঙের কাপড় পরবো।" ঠাকুর বলিতেন, "বাবুরাম শ্রীমতীর অংশে জাত।"

বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট। ভোর চারটা। স্বামিজীর শিষ্য শুদ্ধানন্দজী আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাধি করিয়ে দিতে পারেন?" স্বামী ব্রহ্মানন্দ শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "পারা যায় বৈকি সুধীর। শ্রীমা সব চেয়ে ভাল পারেন। তবে দেখ, তখন ত আর হাঁক ডাক চলবে না। কিন্তু মন যদি স্বাভাবিক ভাবে না উঠে, কাউকে উপর থেকে ফেলে দিলে যেমন সে খুব নীচে পড়ে যায়, তেমনি হয়।" [২]

শ্রীনীরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ঠাকুরের গৃহী শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের শিষ্য। নীরেনবাবু দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিবাহ করিব কি?' উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটা কেন, সাতটা বিয়ে করতে পার। কিন্তু বিবাহ করে স্ত্রীকে মার মত দেখবে।" ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার দেহরক্ষার ছয় মাস পরে নীরেন বাবুর বিবাহ

২ স্বামী হরানন্দ কথিত।

হইল। প্রথম হইতে নীরেনবাবু স্বীয় পত্নীতে গুরুর আদেশ মত মাতৃবুদ্ধি করিতেন। বিবাহের পর বহু মাস অতীত হইল। এক দিন রাত্রে নীরেনবাবু স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজায় সারদাদেবী করাঘাত করিতেছেন। নীরেনবাবু দরজা খুলিয়া দিতেই সারদাদেবী একটী শিশু গ্রহণ করিবার জন্য নীরেনবাবুকে আদেশ করিলেন। নীরেনবাবু শ্রীশ্রীমায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা আমায় ক্ষমা করুন। গুরুর আদেশ কিরূপে লঙ্ঘন করি ?" তাহাতে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "গুরুর গুরুর আদেশে তুমি শিশুটীকে লও।" নীরেনবাবু বাধ্য হইয়া শিশুটীকে লইলেন। উক্ত স্বপ্নের এক বৎসর পরে তাঁহার একটী কন্যা হইল। তৎপরে তাঁহার প্রাণে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে, মা ঠাকুরুণের দেখা পাইলে বলিব, মা আমার যেন আর ছেলেপুলে না হয়। সুদৃঢ় সংকল্প দীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকে না। এক বৎসর পূজার সময় নীরেনবাবু জয়রামবাটীতে গেলেন এবং মহাষ্টমীর দিন সকালে রক্তজবা দিয়া মায়ের পূজা করিয়া চরণদ্বয় ধরিয়া রহিলেন। অন্তর্য্যামী জননী ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, "কি বলিবে বাবা বল।" ভক্ত সাহসভরে প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, আপনার আদেশে আমার একটী মেয়ে হয়েছে। আর যেন আমার ছেলেপুলে না হয়।" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "তাই হবে বাবা। তোমার আর ছেলেপুলে হবে না।" শ্রীমার কথা সত্য হইল, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ভক্তের আর কোন সন্তান হয় নাই। উক্ত ভক্ত জানিতেন, মা কালীর বাম পাটী সামান্য একটু ছোট। তিনি ভাবিয়া ছিলেন,- মায়ের বাম পাটাও হয়ত একটু ছোট হইবে। তিনি শ্রীমার পা পূজা করিবার সময় সত্যই দেখিলেন, শ্রীমার বাম পাটী একটু ছোট। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তৎশিষ্য স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীমাকে জগন্মাতারূপে দেখিতেন। শ্রীমাও বলিতেন, "আমাকে যে জগন্মাতা ভাববে তার পূর্ণ জ্ঞান।" ঠাকুরও বলিতেন, আমাতে যে ঈশ্বর বুদ্ধি করবে সে পূর্ণ জ্ঞানী।

ভুগিতেছিলেন। তিনি পায়খানায় যাইতে যাইতে মলত্যাগের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া স্বীয় পরিহিত বস্ত্রে কিঞ্চিৎ মলত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ তখন উক্ত আশ্রমে ছিলেন। তিনি তাহা দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলেন "কাপড়টা ছেড়ে এখানে রাখ এবং শীগ্‌গির পায়খানায় যা।" ব্রহ্মচারী মঠাধ্যক্ষের আদেশ পালন করিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী শিবানন্দ মলযুক্ত কাপড়খানি জলে ভালরূপে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিলেন। ব্রহ্মচারী পায়খানা হইতে ফিরিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। মহাপুরুষ শিবানন্দ এইরূপ নিরভিমান এবং শিষ্য-বৎসল ছিলেন।

আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটীরের রাম মহারাজ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যখন স্থূল দেহে ছিলেন এবং কলিকাতায় আসিতেন আমি তখন কলিকাতায় এবং আমার বয়স বার তের বৎসর। কি দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার দর্শন লাভ হইল না!" রামকৃষ্ণানন্দজী ব্রহ্মচারী রামকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুমি ত স্বামীজিকে দেখেছ। স্বামীজিকে দেখা, আর ঠাকুরকে দেখা একই কথা। উভয় অন্তরে অভিন্ন, দেহে মাত্র ভিন্ন।"

স্বামী শিবানন্দ একদিন বেলুড়মঠে নিঃশব্দে বারান্দার নীচ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি তখন বেলুড় মঠের সহকারী অধ্যক্ষ। আড়াল হইতে কোন অনবধান ব্রহ্মচারী থুথু ফেলিয়াছিলেন। সব থুথু শিবানন্দজীর গাত্রে যাইয়া পড়িল। ব্রহ্মচারী স্বীয় অন্যায় আচরণে আতঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া যাইয়া শিবানন্দজীর পায়ে পড়িলো। স্বামী শিবানন্দ ইহাতে আদৌ বিরক্ত বা ক্রোধান্বিত না হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে? একটু জল দে, ধুয়ে ফেলি।" ব্রহ্মচারী জল আনিতেই তিনি তাঁহার বুকের উপর হইতে থুথু ধুইয়া ফেলিলেন এবং এমন প্রশান্ত ভাব দেখাইলেন, যেন কিছুই হয় নাই। অক্রোধ পরমানন্দ শিবতুল্য শিবানন্দজী বেলুড় মঠের তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারী-দিগকে স্বীয় সন্তানতুল্য জ্ঞান করিতেন।

যুগাচার্য বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী সদানন্দ শেষ অসুখের সময় বাগবাজার বসু পাড়া লেনে ছিলেন। তিনজন যুবক ভক্ত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল। স্বামী সদানন্দ মান্দ্রাজ মঠে রামকৃষ্ণানন্দজীর প্রথম সহকারী ছিলেন। শশী মহারাজ অসুস্থ সদানন্দজীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। উপরোক্ত যুবক ভক্তত্রয় তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি সহাস্যে তাঁহাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তন্ মন্ ধন্ দিয়েই ভগবানের সেবা করছ। সাধুসেবা করলেই ঈশ্বর-সেবা হয়।"

মহরমের সময় বেলুড়মঠে স্থানীয় মুসলমান যুবকেরা খেলা দেখাইতে আসিয়াছে। মঠের স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি প্রবীন সন্ন্যাসীগণ এবং নবীন সাধুব্রহ্মচারীরা সেই খেলা দেখিতেছেন। খেলা শেষ হইলে মুসলমান যুবকেরা সমবেত সাধুদের নিকট কিছু চাহিলেন। সকলে ভাবিল, সাধুরা আর কি দেবেন, খুব বেশী দুই চার আনা। মহাপুরুষ শিবানন্দজী পাঁচ টাকার একটি নোট স্বীয় পকেট হইতে বাহির করিয়া যুবকদের দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তোরা বেশ খেলা দেখিয়েছিস।" মুসলমান যুবকেরা খুব খুশী হইয়া চলিয়া গেল।

ঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামী প্রেমানন্দ শোকাভিভূত হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঘাটে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন। ঠাকুর তখন সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভূত হইয়া প্রিয় শিষ্যের চিবুক ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কি করতে যাচ্ছিস? আমি আর কোথায় গেছি, তোদের পিছনে পিছনে ছায়ার মত আছি।" গুরুদর্শনে শিষ্যের তীব্র শোক দূরীভূত হইল। শিষ্য আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কলিকাতায় উদ্বোধন মঠে দেহরক্ষা করেন। তখন শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে। ইহার কয়েক দিন পরে কোন ভক্ত বাঁকুড়া হইতে জয়রামবাটীতে গিয়াছেন। শ্রীমা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা আমার শশী চলে গেছে, আমার যেন কোমরটা

ভেঙ্গে গেছে।" এই বলিয়া শ্রীমা ভক্তকে দেখাইয়া স্বীয় কোমরে হাত দিলেন এবং আরও বলিলেন, "কেষ্টলাল এসেছিল পাল্কী নিয়ে আমাকে নিতে। আমি কেষ্টলালের হাত দুটি ধরে বললুম, ভাদ্র মাস এখন। আমি কি করে যাই বল?" সন্তানগতপ্রাণা সারদাদেবী সন্তানের মৃত্যুদর্শন করিতে পারিবেন না বলিয়া কলিকাতা আসিলেন না।

কলিকাতার কোন এটর্নী বেলুড় মঠের পক্ষ লইয়া কোন মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। মোকদ্দমা দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকায় বহুদিন বেলুড়মঠে আসিতে পারেন নাই। অনেক দিন পরে মঠে আসিয়া তিনি স্বামী শিবানন্দকে প্রণাম করিলেন। শিবানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন আসনি কেন?" দুঃখিত চিত্তে এটর্নী অর্থাভাবের কথা জানাইলেন। ইহাতে শিবানন্দজী বলিলেন, "আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি। তা দিয়ে মোকদ্দমা চালাও।" এটর্নী টাকা লইতে সম্মতি জানাইলে শিবানন্দজী কোন সেবকের দ্বারা হাজার টাকা আনাইয়া এটর্নীকে দিলেন। এটর্নী টাকা পাইয়া নিবেদন করিলেন, "আমি একটা হাণ্ডনোট লিখে দি?" তদুত্তরে শিবানন্দজী সহাস্যে বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে তো এ সম্বন্ধ নেই। যদি পার তো দিও, নচেৎ নয়।" গুরুর ন্যায় শিষ্যেরও আদৌ কাঞ্চনাসক্তি ছিল না।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বরাহনগর মঠে ঠাকুরপূজা করিতেন। মঠের তত্ত্বাবধানও প্রধানতঃ তাঁহাকে করিতে হইত। মঠের অদূরেই গঙ্গা। গঙ্গা হইতে জল আনিয়া ঠাকুর-পূজাদি হইত। একদিন সন্ধ্যাবেলা টিপ-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মঠে একটুও গঙ্গাজল নাই। শশী মহারাজ মাটির কলসী একটি ভরিয়া জল আনিতেছেন। মঠের উঠান খুব পিচ্ছিল ছিল, তাঁহার পা পিছলাইয়া গেল; আর তিনি ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। কলসীটিও ভাঙ্গিয়া গেল। মঠবাসী গুরুভ্রাতারা ইহা দেখিয়া হাউ হাউ

করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার ভূপতিত বিশাল বপু আহত হয় নাই।

স্বামী শিবানন্দ একদিন বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। তখন মঠে বৈদ্যুতিক আলো হয় নাই, হ্যারিকেন আলো জ্বলিতে ছিল; কিন্তু উহার আলোকে উঠানের কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তিনি মূত্রত্যাগের উদ্দেশ্যে বারান্দা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় শিষ্যের হাত ধরিয়া নীচে যাইতে নিষেধ করিলেন। এই অলৌকিক দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি উপর হইতে হ্যারিকেনটি নামাইয়া সিঁড়ির দিকে লইয়া দেখিলেন, সিঁড়িতে একটা বড় গোখুরা সাপ শুইয়া আছে। প্রিয় শিষ্যকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার্থ লোকান্তরিত গুরুর আবির্ভাব ঘটিল। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ পরলোক পর্য্যন্ত অনন্ত কাল স্থায়ী হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুরুভ্রাতা। শশী মহারাজ যখন মাদ্রাজ হইতে বেলুড় মঠে আসিতেন তখন উপরোক্ত গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। কারণ, ঠাকুর বলিতেন, “রাখাল ও বাবুরাম ঈশ্বরকোটি।” শশী মহারাজের গুরুভক্তি এবং গুরুভ্রাতৃভক্তি উভয়ই ছিল অতুলনীয়।

শ্রীশ্রীগৌরীমা একদিন বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর একবার ভাবে দেখলেন, সামনে হিমাবৃত অত্যুচ্চ পর্বতের গায়ে সিঁড়ি কাটা এবং উহার শিখর গগনস্পর্শী। কয়েকটি সিঁড়ির উপরে কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি উপবিষ্ট। এমন সময় একটি তেজস্বী তরুণ সিঁড়ির ধাপে ধাপে দ্রুত উঠিয়া শিখরে যাইয়া আকাশে বিলীন হইলেন। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর বুঝিলেন, তরুণটি তৎশিষ্য নরেন ভিন্ন অন্য কেউ নহে।” এযুগে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) ছিলেন সর্বাগ্রণী, বিবেক-বৈরাগ্যে ও ত্যাগ-তপস্যায়।

একদিন শশী মহারাজ ও রাম মহারাজ প্রভৃতি বেলুড় মঠ হইতে নৌকায় বাগবাজারে যাইতেছিলেন সংঘ-জননী সন্দর্শনে। নৌকায় অনেক ঐহিক কথাবার্তা হইল। নৌকা ঘাটে নামিবার কিছু পূর্বে শশী মহারাজ বলিলেন, "এখন আর অন্য কথা ভাল লাগছে না, মায়ের চিন্তায় মন ভরে উঠছে।" তিনি ঠাকুর ও শ্রীমাকে অভিন্ন দেখিতেন।

তিন

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কথাসংগ্রহ*

এলাহাবাদে অবস্থানকালে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সার তেজবাহাদুর সাপ্রুর পুত্র শ্রীআনন্দনারায়ণ সাপ্রু, আই-সি-এস মহাশয়ের মোটরকারে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বেড়াইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "দেখ, এত কারে চড়েছি, কিন্তু এমন আরামদায়ক কারে কখনো চড়ি নি।" সেই দিন সন্ধ্যায় সাপ্রুর বাড়ীতে যাইবার কথা উঠিলে তিনি তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্মতি জানাইলেন। স্বামী মৈথিল্যানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি সাপ্রু-ভবনের ফটকে উপনীত হইলেন, তখন সাপ্রুদের গৃহবধূগণ পুষ্পমাল্য-শোভিত বরণডালা দিয়া তাঁহাকে ভক্তি-ভরে সম্বর্ধনা ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। স্যার তেজবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ সাপ্রু তাঁহার দর্শনলাভের জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দর্শনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশান্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ তিনি অন্যান্য সকলের সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ সাপ্রু তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে

---

* উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩৫৬ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত।

অনুরোধ করিলে তিনি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন, "Oh ! He was a very simple and plain man. He used to be constantly immersed in the thought of the Divine Mother, the creatrix of the universe." (আহা! তিনি খুব সরল ও সাদাসিধে লোক ছিলেন। বিশ্বপ্রসবিণী জগন্মাতার চিন্তায় তিনি সর্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন!) বিজ্ঞান মহারাজের কথা শেষ হইলে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "এঁর এত বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও মস্তিষ্ক সতেজ ও চিন্তাশক্তি অক্ষুণ্ন।" তাঁহার পূত সঙ্গ লাভে তাঁহারা পরম তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। বিদায়ের পূর্বে তিনি সাপ্রু-ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "Be happy in life. Be prosperous in life." (জীবনে তোমরা সুখী হও ও সমৃদ্ধিশালী হও।)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কোন মাদ্রাজী মন্ত্রশিষ্য নানা দার্শনিক প্রশ্ন তুলিয়া স্বীয় সংশয় প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহার উত্তর তিনি অতি অল্প কথায় এই ভাবে লিখিয়াছিলেন, "The mantras themselves will throw light in you. You need not be anxious. Repeat them daily morning and evening ; all your doubts will be cleared as mists are cleared on the sun rising and you are certain to be blessed." (তোমাকে যে মন্ত্রগুলি দিয়াছি সেগুলি স্বয়ংই তোমার অন্তরে আলোক সম্পাত করিবে। তোমার উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই মন্ত্র জপ করিও। সূর্য্য উঠিলে যেমন কুয়াশা অন্তর্হিত হয় সেইরূপ তোমার চিত্ত হইতে সংশয়গুলি দূর হইয়া যাইবে। নিশ্চয়ই তুমি ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিবে।) সিদ্ধ গুরুর এই কয়েকটি বাক্যে শিষ্যের মনের অন্ধকার অচিরে কাটিয়া গিয়াছিল।

১৯৩৮ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বিন্ধ্যাচলে গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠের কোন সাধু তপস্যা করিবার সময় নিম্নোক্ত অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—তাঁহার ঘরের দরজার পাশে রাত্রি তিনটার একটু পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ হঠাৎ সূক্ষ্ম দেহে আসিয়া বসিলেন। সাধুটি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখিতে পাইলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। বিজ্ঞান মহারাজ অতি করুণার্দ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার অশুভ বাসনা কিছু রয়েছে।" দৃঢ়তার সহিত দুই বার বলিলেন, "কেটে যাবে, কেটে যাবে। এক দিন আমার কাছে এসো, বলে দেব। দুবার একবার আসবে!" সাধুটি স্বীয় অশুভ বাসনার কথা ভাবিয়া এবং মহারাজের অহৈতুকী কৃপা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

এই ঘটনার পরে সাধুটি বিন্ধ্যাচল হইতে চলিয়া আসেন। কিন্তু এলাহাবাদে যাইয়া এই বিষয়ে বিজ্ঞান মহারাজকে কিছু বলিতে পারিলেন না বলিয়া মনে মনে আপশোষ করিলেন। সাধুটির কর্মোপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে যাইবার কথা হয়। পাছে তাঁহার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ না হয় এই আশঙ্কায় তিনি চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সেই বৎসর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির পূর্ব দিন বেলুড় মঠে আসিয়াই শুনিলেন, বিজ্ঞান মহারাজ অপ্রত্যাশিত ভাবে মঠে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সাধুটি অবাক্ হইলেন। কিন্তু স্বীয় জীবন-সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাইয়াও এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। ৩রা মার্চ বৃহস্পতিবার ঘটনাক্রমে সাধুটি একান্তে তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইলেন। বিজ্ঞান মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক সাধুটি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের যে ফটো দুটি দিয়েছেন তা ধ্যান করি। কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে।" স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল!"

সাধুটি বিনয় বাক্যে নিবেদন করিলেন, "আমার [illegible] কেমন করে কাটিবে?" বিজ্ঞান মহারাজ সস্নেহ ও [illegible] সহিত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিলেন, "ও চলে যাবে। ওদিকে মন না দিলেই ভাল।"

সাধু—ঠাকুর ও মায়ের ধ্যান এবং নামজপ করলেই যাবে?

বিজ্ঞান মহারাজ—হাঁ, ওতেই যাবে, ঐ করলেই যাবে।

এই কথার পর তিনি স্বর করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর। এখন আমি শোব। তুমি এস।" এই বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন।

পূর্বোক্ত সাধু একদিন সকালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে এলাহাবাদে দর্শন করিতে যান। সাধুটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে তিনি তাঁহার সম্মুখে একটি চেয়ারে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ তখন তাঁহার কাছে তুলসীদাসের প্রেতদর্শন এবং রামায়ণ-পাঠকালে হনুমানজীর সহিত সাক্ষাৎ ও বিন্ধ্যাচলে রামলীলাদর্শন প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তুলসীদাস সম্বন্ধে বলিলেন, "একবার হনুমান তাঁকে রামায়ণ লিখতে আদেশ করেন। তুলসীদাস উত্তর দেন, 'আমি যে রামায়ণ লিখবো, আমার সে রামভক্তি কই?' এই কথা বলিয়াই বিজ্ঞান মহারাজ ভাবগদগদ চিত্তে অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ ভক্তিবিহ্বল দেখিয়া সাধুটিও আত্মহারা হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞান মহারাজ স্বীয় ভাব সংবরণ করিয়া সাধুটিকে হাত তুলিয়া শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রথম দীক্ষাদানের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ খ্রীঃ তিনি স্বারকাধাম দর্শনান্তে রাজকোট আশ্রমে একদিন থাকিয়া বোম্বাই আশ্রমে গমন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দজী তখন অন্যত্র গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামী জপানন্দজী বোম্বাই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন বিজ্ঞান মহারাজের সেবার

02728

তত্ত্বাবধানার্থ। বোম্বাইতে কালেকর নামে একজন তরুণ মারাঠী ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা পরম ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন স্বামী গুণাতীতানন্দজীর নিকট। গুণাতীতানন্দজী বিজ্ঞান মহারাজের অনুমতি না লইয়াই বৃদ্ধকে কথা দেন, তিনি তাঁহার দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত বৃদ্ধ তদনুযায়ী প্রস্তুত হইলেন এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া ফেলিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ যে দিন বোম্বাই আশ্রমে পৌঁছিলেন, সে দিন সন্ধ্যায় স্বামী গুণাতীতানন্দজী বৃদ্ধকে পরদিবস দীক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা জানান। তিনি ইতঃপূর্বে দীক্ষা দেন নাই; তাই গুণাতীতানন্দজীর অনুরোধে ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং দীক্ষা দিতে অস্বীকার করিলেন। স্বামী জপানন্দজী আশ্রমবাসী সাধুদের অনুরোধে মহারাজকে সম্মত করিবার জন্য গেলেন। প্রথমে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন জপানন্দজী তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, "আপনি ঠাকুরের সন্তান! আপনি ঠাকুরের নাম শুনাইয়া দিবেন। তাহাতেই দীক্ষা হইবে।" তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে বিজ্ঞান মহারাজ কিঞ্চিৎ সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "আমি কিন্তু সকালে স্নান করতে, ঠাকুর ঘরে যেতে, বিছানা ছেড়ে অন্য আসনে বসতে বা চা খাওয়া বন্ধ করতে পারবো না।" স্বামী জপানন্দজী বলিলেন, "আপনি সদা শুদ্ধ। আপনার স্নান করা, কাপড় ছাড়া বা আসনে বসার প্রয়োজন নেই। আপনি যেখানে বসবেন সেইখানেই ঠাকুর-ঘর হবে। আপনি বিছানায় বসেই দীক্ষা দেবেন।" উক্ত প্রস্তাবে বালকবৎ তিনি রাজী হইলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি কাপড় ছাড়িলেন এবং চা খাইলেন না। দীক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার পদতলে বসিলেন এবং বিজ্ঞান মহারাজ বিছানায় বসিয়াই তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম দীক্ষাদান। দীক্ষাদানের পর গুরু শিষ্যকে স্বীয় জপমালা দিয়াছিলেন। উক্ত

মালা তিনি নিজে প্রায় চল্লিশ বৎসর জপিয়াছিলেন। তখন তিনি স্বামী জপানন্দজীকে একটি মালা আনিয়া দিতে নির্দেশ দিয়া বলেন, "পনের বৎসর পূর্বে কোন জৈন সাধুর জপমালা দেখেছিলাম। তখন থেকে এই মালা নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি সেরূপ একটি মালা এনে দাও।" এই প্রকার জপমালা রেশমী সূতায় তৈরী করেন জৈন সন্ন্যাসিনীগণ। এই সকল বাজারে পাওয়া যায় না, জৈন সাধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। স্বামী জপানন্দজী বোম্বাই শহরে যাইয়া একজন জৈন স্ত্রীভক্তের নিকট হইতে অতিকষ্টে সেই মালা যোগাড় করেন। এক জন জৈন সাধু চল্লিশ দিন উপবাসান্তে উক্ত স্ত্রীভক্তের নিকট আহার্য গ্রহণ করেন এবং আশীর্বাদরূপে দুইটি মালা তাঁহাকে দেন। সেই দুইটি মালা আনিয়া স্বামী জপানন্দজী বিজ্ঞানানন্দজীর হাতে দিতেই তিনি বালকবৎ আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার পনের বৎসরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে!" এই বলিয়া তিনি মালা হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ জপ করিতে লাগিলেন।

ইউরোপের প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক সি. জে. জুং কলিকাতায় আসিয়া বেলুড়মঠে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাঃ জুং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মন্দিরের পরিকল্পনা কি আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন?" তদুত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বলেন, "হাঁ, তিনি আমাকে ideas (ভাব) দিয়েছিলেন এবং নক্সা করতে বলেছিলেন। প্রথম নক্সাটি আমি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী করে তাঁকে দেখাই। ঐটি তিনি পছন্দ করলেন না। এইরূপে দুই তিন বার নক্সা করে তাঁকে দেখান হয়। শেষেরটি দেখে তিনি বলেন, অনেকটা হয়েছে। মূলতঃ তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে এই মন্দির নির্মিত।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, "স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে থাকতেন তখন মঠটি আমার কাছে জ্যোতির্ময় প্রতীত হত, দূর থেকে তা আমি

বেশ টের পেতুম। তিনি মঠে না থাকলে মঠটি নিষ্প্রভ দেখাত। বাইরে থেকে এসে মঠে ঢুকলেই বুঝতে পারা যেত, স্বামীজী মঠে আছেন কি নেই।” বিজ্ঞান মহারাজ বেলুড় মঠের দ্বিতলস্থ ক্ষুদ্র একটি কক্ষে থাকিতেন, যেটিকে 'খোকা মহারাজের ঘর' বলা হয়। উহার দক্ষিণেই স্বামীজীর কক্ষ। একরাত্রে বিজ্ঞান মহারাজ ঘরের বাহিরে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ধারের বারান্দায় তিনি শুনিলেন, স্বামীজীর ঘর হইতে করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি আসিতেছে। ইহা শ্রবণে তাঁহার মনে হইল, স্বামিজীর শরীর বোধ হয় অসুস্থ। তাই তাঁহার মুখ হইতে এই ব্যথিত স্বর আসিতেছে। তিনি স্বামীজীর ঘরে যাইয়া দেখিলেন, স্বামিজী মেজের উপর পড়িয়া করুণ স্বরে কাঁদিতেছেন! বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, আপনার কি শরীর খারাপ?” তখন স্বামীজীর চেতনা হইল। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, “কে, পেসন? আমি ভেবেছিলাম, তোমরা সব ঘুমিয়ে পড়েছ।” তখন বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী ব্যথিত চিত্তে সজল নয়নে বলিলেন, “দেশের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার কথা ভেবে ভেবে আমি ঘুমুতে পারছি না, মনটা বেদনায় ছটফট করছে। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, এদেশের সুদিন আসুক, দুর্দিন চলে যাক।” বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিয়া বিছানায় শোয়াইলেন! দেশের দুঃখদারিদ্র্যে স্বামীজীর প্রেমপ্রবণ প্রাণ শেলবিদ্ধ হইত।

হলিউড বিবেকানন্দ হোমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সারনাথ মিউজিয়ামে তাঁহার অলৌকিক দর্শনের বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তদন্তে নিম্নোক্ত অলৌকিক অনুভূতির কথাটিও বলিয়াছিলেন। এক শিবরাত্রির দিনে কাশী অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধুগণ বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজকে কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন, “মহারাজ, আপনি মন্দিরে যাবেন কি?”

তিনি কৌতুক করিয়া বলিলেন, "ঐ পাথরখানা দেখতে আর কি যাব?" কিন্তু পরে তিনি বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হয়। তিনি দেখেন—মন্দির হইতে শিবলিঙ্গ অন্তর্হিত। ক্রমে সেই মন্দির ও দৃশ্যমান বিশ্ব কোথায় মিলাইয়া গেল। বিশ্বনাথের বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন বিরাট স্বরূপ অনুভূত হইল। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। বাহ্যিক সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আশ্রমে ফিরিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী যখন এলাহাবাদে ছিলেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অন্যত্র যাইবার পথে তথায় উপস্থিত হন। তিনি বলিতেন, "বিজ্ঞান মহারাজ গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি সহজে ধরা দিতে চান না।" বিজ্ঞান মহারাজও ঠাকুরের এই মানস পুত্রকে কত ভক্তি করিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়। একজন ভক্ত এলাহাবাদ মঠে আসিয়া বিজ্ঞান মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে বলেন, "সংঘাধ্যক্ষ এখানে উপস্থিত। তাঁর কৃপা পেলে ঠাকুরের কৃপাই পাওয়া হবে।" তদনুযায়ী ভক্তটি ব্রহ্মানন্দজীর নিকট গেলেন। ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "বিজ্ঞান মহারাজ স্থানীয় মঠের অধ্যক্ষ। তিনি গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ। আপনি তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হোন।" ভক্তটির পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় এবং ব্রহ্মানন্দজীর সপ্রেম অনুরোধে বিজ্ঞান মহারাজ নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া যান এবং কিছু উপদেশ দেন। পরে ব্রহ্মানন্দজীর একটি ফটো তাঁহাকে উপহার দিয়া বলেন, "এই মূর্তির পূজা ও ধ্যান করলেই আপনার সব হবে। ইনিই আপনার গুরু।" ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের গুরুগিরির বাসনা আদৌ ছিল না। পরদুঃখে কাতর হইয়া মানুষের ভবরোগ দূর করিবার জন্য কৃপাবশে তাঁহারা দীক্ষাদি দিতেন। গুরুশক্তি তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ প্রকটিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সাধারণ গুরুগিরি করেন নাই।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থের যে সুন্দর ইংরেজি

অনুবাদ করিয়াছেন তাহা এলাহাবাদ পাণিনি অফিস হইতে প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি শাস্ত্র। অনুবাদের নানা স্থানে অনুবাদক যে সকল সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন সেগুলিতে সাধনরহস্যের সুগূঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি তাঁহার একটি সুচিন্তিত মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "মনোভূমি ও বুদ্ধিভূমিতে দেবগণ কারণদেহে পূর্ণরূপে বিরাজিত। যখন তাঁহারা নিম্ন ভূমিতে নামিয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করেন, তখন আংশিক ভাবে তাঁহারা আবৃত হন। কিন্তু তখনই আমরা তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। দেবগণ সকলেই বাস্তব ও সত্য। তাঁহাদের আকৃতি আছে। যদি মানব বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের রূপ দর্শনের ইচ্ছা করে তবে দেবরূপ দৃষ্টিগোচর হয় হৃদয়ে অনাহত চক্রে বা ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে। মন মস্তিষ্কে সংস্থিত সহস্রারে উত্থিত হইলে দেবরূপ অনন্ত জ্যোতিসাগরে বিলীন হয়। সহস্রারে যে দিব্য জ্যোতিঃ বিরাজমান তাহাই নিম্ন লোকে নামিয়া রূপধারণ করেন। দেবগণ ইচ্ছামত আকৃতি পরিগ্রহ করিতে পারেন। বহির্জগতের বস্তুসমূহ আমরা যে ভাবে দেখি সেই ভাবে দেবমূর্তি দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, দেবগণ মানুষ, পশু, বৃক্ষ বা প্রস্তরাদি জড় বস্তুর মূর্তিও ধারণ করেন। ভক্তগণ যে ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন আলোকচিত্রে, প্রতিমায়, প্রস্তরে, বায়ুতে, জলে বা অগ্নিতে তাঁহার অস্তিত্ব অনেক সময় অনুভূত হয় অদ্ভুত ভাবে লেলায়মান জ্যোতিঃরূপে। এমন কি, ভক্তগণ অনেক সময় দেবগণকে কথা বলিতে শুনেন মৃদু অস্ফুট স্বরে।"

"শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়-বৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রারেও থাকেন। ঊর্ধ্বে দেবলোকেও বৃন্দাবন ধাম আছে। শ্রীমহাদেব কৈলাসনিবাসী। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়, যেখানে আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রারে মিলিত, তথায় কৈলাসধাম অবস্থিত। ব্রহ্মা নাভিদেশস্থ মণিপুরচক্রে থাকেন। নিম্ন স্তরের কয়েকটি দেবতা ও ভক্তগণ দেবগণের

পার্ষদরূপে আছেন। মৃত্যুর পর মানবগণ পিতৃলোকে গমনপূর্বক পরমানন্দে পিতৃগণের সহিত বাস করেন। কিংবা তাঁহারা দেবলোকেও যান এবং বিশেষ বিশেষ দেবতা ও দেবলোকের প্রতি আকর্ষণানুসারে স্ব স্ব ইষ্টদেবের সেবকরূপে থাকেন। যাঁহারা স্বর্লোকে যান তাঁহারা ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণাদি দেবগণের সহচররূপে অবস্থান করেন। দুষ্কৃতির বশে কেহ কেহ প্রেতলোকে বা অন্য নিম্ন লোকে বা নরকেও যাইয়া থাকেন। সেই সকল লোকেই পাপক্ষয় করিতে হয়।"

"দেবগণের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে। তাঁহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সৃজনক্ষম। তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম বহু দূরে প্রসারিত বা বিন্দুমাত্ররূপে সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ। তাঁহারা যে জ্যোতির্মণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকেন তাহা বিবিধ বর্ণযুক্ত ও বহুদূর বিস্তৃত। তাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ আছে। ইহাদের কার্য অতি সূক্ষ্ম কারণরাজ্যে বা ভাবলোকে প্রকটিত হয়। সেইগুলি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন ইহলোকে আমাদের সত্তা সূক্ষ্মতর কারণভূমিতে যায়, যেমন সুষুপ্তিতে, তখন আমরা তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ বা কারণ-শরীর দেখিতে পাই। দেবগণ স্থূল দেহ ধারণেও সমর্থ।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 'নারদপঞ্চরাত্রে'র ইংরেজি অনুবাদে নিম্নোদ্ধৃত তিনটি সুচিন্তিত মন্তব্যে পূজাতত্ত্ব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "পূজার উদ্দেশ্য দেহ, মন ও বাক্যের অশুদ্ধি দূর করা এবং অমরাত্মা বা পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। প্রধানতঃ আমাদের দেহবুদ্ধি প্রবল বলিয়া দেহ হইতেই আরম্ভ করা উচিত। পূজায় বা জপে ভক্ত দেহের যে যে অঙ্গ বা করাংশ স্পর্শ করেন সেগুলি অদ্ভুত ভাবে সুষুম্না নাড়ীর তিনটি কেন্দ্রে—নিম্নে মূলাধার, মধ্যে হৃদয় এবং ঊর্ধ্বে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত আর চারটি অঙ্গুলির উপর সেইরূপ দ্বাদশ বার

জপ করিতে হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে এইরূপ তিন তিন বার জপ বিধেয়। তখন আমরা জপের পূর্ণ সংখ্যা ৯×১২=১০৮ পাইব। অতএব জপ ও পূজা বিশুদ্ধ এবং আত্মস্থ হইবার উপায়মাত্র। বিশুদ্ধ সাধক জীবাত্মার দ্বারা পরমাত্মার প্রকৃত মানস উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহার বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই।"

"শ্রীহরির নিত্যপূজা শালগ্রাম শিলায়, দুর্লভ রত্নে, মূল্যবান্ প্রস্তরে, যন্ত্রে ও মণ্ডলে করিতে হয়, কখনো ভূমিতে করিতে নাই। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সুনীচ ও সুনম্র হইলে এবং বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে অসৎ সঙ্গের পাপ প্রনষ্ট হয়। শালগ্রাম পূজা করিলে ভবিষ্যৎ জীবনের কামনাও পূর্ণ হয়।"

চার

রাড়ীখালে স্বামী প্রেমানন্দ *

পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত রাড়ীখাল গ্রাম। তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ব্রহ্মচারী হরিহর, বিমল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি (১৯১৫ খ্রী: এপ্রিলের শেষে ও মে মাসের প্রথমে) ১০।১২ দিন অবস্থান করেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাসভবনে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। জগদীশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশ বাবু এবং গ্রামের মুকুন্দলাল বসু প্রমুখ ভদ্রলোকগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। রাড়ীখালে স্বামী প্রেমানন্দের নিকট দিনরাত লোকের ভিড় লাগিয়া থাকিত। দলে দলে হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-স্ত্রীলোক,

---

* ঢাকার ভক্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি হইতে সংকলিত এবং উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বালক-বৃদ্ধ তাঁহার কাছে আসিতেন। সকলেই ভাবিতেন, ইনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। ঢাকা পোগোজ হাই স্কুলের পণ্ডিত শ্রীসূর্যকান্ত ভট্টাচার্য রাড়ীখালের অধিবাসী। তিনি প্রেমানন্দজীর নিকটে বসিয়া নিজের পারিবারিক দুঃখকাহিনী বলিতেছেন। তাঁহারা তিন ভাই ছিলেন। উপার্জনক্ষম কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়স্কা পত্নী রাখিয়া সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার মাতা শোকসন্তপ্তা। স্বামী প্রেমানন্দ উক্ত শোকসংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইলেন এবং সান্ত্বনাদানের জন্য বলিলেন, "মণি মল্লিক নামে এক ব্রাহ্ম ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতেন। তাঁহার বড় ছেলে কেশব বাবুর সমাজে ঠাকুরকে দেখিয়া বাপকে বলিয়াছিল, 'বেশ সাধু দেখেছি, আপনি দেখতে যাবেন?' তারপর মণি মল্লিক এলে তাঁকে প্রথম দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমিই না অমুকের বাপ? তোমায় দেখে এই মনে হচ্ছে!' তারপর সেই ছেলেটি মারা গেল। মণি মল্লিক খুব শোকার্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে এলেন। তাঁকে শোকার্ত দেখে ঠাকুর প্রথম বল্লেন, 'তাই ত। কি করবে? পুত্রশোক কি কম?' ইত্যাদি। তারপর একটু স্থির হয়ে থেকে বাঁ হাতে ডান হাত চাপড়ে গান ধরলেন—

"জীব সাজ সমরে।
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥
ভক্তি-রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান-তূণ
রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ॥
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে॥
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথরথী
শত্রুনাশে জীব হয়ে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥"

যাবার সময় মণি মল্লিক বলেছিলেন, 'আমার মন একেবারে শান্ত হয়েছে। এখন আর শোক নেই'।"

পরদিন স্বামী প্রেমানন্দ বিমল প্রভৃতি সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, এই যুবকদের উৎসাহ দেখে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। ঠাকুর আমাদের কত রসগোল্লা খাইয়েছেন, কত ভালবেসেছেন। তবে আমরা তাঁর কাছে গেছি। আর এরা কি পেয়েছে? শুধু বইয়ে তাঁর কথা পড়েছে। এদের কি উৎসাহ, কি আনন্দ! এই রোদে পুড়ে ষ্টেশনে গেছে, নিজেরা সব জিনিষ বয়ে এনেছে, খালি পায়ে শুধু মাথায়; আবার নিজেরা রেঁধে খাওয়াচ্ছে। আবার কলেরা রোগীর সেবা করে এরা, নিজেদের মান-অভিমান ভয় সব ছুঁড়ে ফেলে। এদিকে লেখাপড়ায় সকলেরই মনোযোগ। এসব দেখে আমার আনন্দ ধরে না! এই দেখতেই ছুটে ছুটে আসি, নাম কিনতে নয়। আমি কি করছি? তিনিই ত সব করে রেখেছেন আমি আসবার আগে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে তাঁর পূজা হবে, প্রত্যেকে তাঁর ভাব নেবে। তোরা বেরিয়ে পড়, সর্বত্র তাঁর নাম প্রচার কর।' সেই মহাপুরুষের আদেশে চার দিকে ছুটে বেড়াই। তা নইলে আমি মুর্খ, কি প্রচার করবো? এ সব দেখে মনে হয়, দেহটা ত যাবেই। ঘরে বসে থেকে সময়মত চারটে খেয়ে, শরীরটা সুস্থ রাখলে আর কি লাভ হবে? একটু কষ্ট করে এলে যদি আমাকে পেয়ে ওদের উৎসাহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বেড়ে যায় তাহলে আমার না হয় একটু কষ্ট হলই। তা নইলে এতটুকু পালকিতে চড়ে আসা, বেলা তিনটায় খাওয়া, রাত্রে অনিদ্রা, এতে যে কি সুখ তাত দেখছ। কিন্তু তা হলেও ঠাকুর স্বামীজী পূর্বে যা বলে গেছেন এসব জায়গায় তা প্রত্যক্ষ দেখছি; আর ধন্য হয়ে যাচ্ছি। তোদের আর বেশি কিছু করতে হবে না। এসব তলিয়ে দেখ, তাহলেই তাঁর ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা আপনা আপনি আসবে। সর্বদা বসে ধ্যান করা কি সোজা কথা? অসম্ভব! একবার মঠের কয়েক জনের বসন্ত হওয়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে তাদের রেখে ভাত পাঠিয়ে দেওয়া

হত। সেরে গেলে তাদের ওখানেই ধ্যান-ধারণা করতে বলা হল। কিন্তু কিছু দিন বাদে তারা বলে পাঠাল, "প্রথমে ভেবেছিলুম নির্জনে খুব ধ্যান করব! কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে, আর কিছু দিন এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব।" তাই যতটুকু সম্ভব ধ্যান-ধারণা করে অবশিষ্ট সময় নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে হয়। তাহলে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে মন আপনি তাতে লিপ্ত হয়ে যায়।"

সময়ান্তরে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার বাল্যজীবন ও গর্ভধারিণী সম্বন্ধে রাড়ীখালে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"মা মাঝে মাছে কপাট বন্ধ করে সমস্ত দিন ধ্যান করতেন। সে সময় ছেলেরা কলকাতা থেকে আঁটপুরে এলে অন্য এক বাড়ীতে থাকত, পরদিন মার সঙ্গে দেখা হত। তাঁর খুব কঠোর শাসন ছিল। মিথ্যা বললেই মার দিতেন। পাড়াগাঁয়ে পড়াশুনা হবে না বলে আমাদের কলকাতায় পাঠাতেন। ওদিকে বধূঠাকুরাণীদিগকে ও ঝিদের কখনো কড়া কথা বলতেন না। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'বিদ্যাশক্তি'। ভাইদের নানারূপ ঘরে বিয়ে হয়েছিল। তাদের জন্য মাকে মাঝে মাঝে কথা শুনতে হত। তাই আমাকে বলেছিলেন, 'তোর জন্যে তো আমায় কিছু শুনতে হয় না।' আমি ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলুম। দেখ, আমার মাথায় এখনও কেমন দাগ রয়েছে। স্বামীজী বলতেন, যার মাথায় গায় দাগ নেই সে আবার ছেলে!"

মহাপুরুষ শিবানন্দ *

"শিবে যস্য পরাভক্তিঃ ত্যাগেঽপি রতিরুত্তমাঃ।
অহৈতুক-কৃপাসিন্ধুং শিবানন্দং নমাম্যহং ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ অভিন্ন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ ও সারদানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্যোতিষ্কের এক একটী উজ্জ্বল রশ্মি। সৌর মণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহ যেমন সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানগণও তদ্রূপ তাঁহার শক্তির অধিকারী ছিলেন। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" বাইবেলে জিশুখীষ্ট স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, অবতার ও তৎশিষ্যগণ সমান শক্তিসম্পন্ন।

নবযুগেও আমরা এই বাক্যের জ্বলন্ত উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎশিষ্যগণের মধ্যে দেখিতে পাই। আধ্যাত্মিকতার ভাবঘনমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটী ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন তাঁহার এক একজন শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থূল চক্ষে দেখিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হয় নাই তাঁহারা তৎশিষ্যগণের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। জিশুখীষ্ট সত্যই বলিয়াছেন, অবতারকে দর্শন করিলেই যেমন ভগবানকে দর্শন করা হয়, সেইরূপ অবতারের শিষ্যগণকে দর্শন করিলে অবতারকেই দর্শন করা হয়। স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সূর্য্যের দিকে সোজাসুজি তাকাইলে চক্ষু ঝলসিয়া যায় মাত্র, সৌর কিরণের ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু জলে

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৩ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত এবং স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্ত্তক লিখিত।

প্রতিবিম্বিত সূর্য্য দর্শনে সৌর জ্যোতির অনুমান করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভূতপূর্ব্ব ও অলৌকিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ক্ষুদ্র মানব-মন এত বিস্ময়াবিষ্ট হয় যে, তাঁহার অসীম আধ্যাত্মিকতার কোন ইয়ত্তা করিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে তাঁহার মহাসিদ্ধ পার্ষদগণের জীবন ও সাধনা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা আবশ্যক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম ব্রহ্মলীন পার্ষদ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান করা সেইজন্য আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাপুরুষ শিবানন্দের বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে তিন খানি পুস্তক * প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জনৈক শিষ্যকে লিখিত পত্রাবলী এবং তদ্দৃষ্ট ঘটনাসমূহ হইতে এই লোকোত্তর মহাপুরুষের দিব্য জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস গ্রহণের চেষ্টা করা হইল। এই সকল ঘটনা ও পত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ শিবানন্দ মহারাজকে যে 'মহাপুরুষ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আক্ষরিক-ভাবে সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শিবানন্দ 'মহাপুরুষ' নামেই অভিহিত হইতেন। সত্যই শিবানন্দ ছিলেন প্রকৃত মহাপুরুষ! তিনি ছিলেন ত্যাগ-তপস্যার ঘনীভূত মূর্ত্তি। যে ভাবস্রোত বাংলা হইতে প্রবাহিত হইয়া আজ ধর্ম্ম-জগতের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে, শিবানন্দ তাহার অন্যতম স্রষ্টা। তাঁহার ন্যায় সংযত-জিহ্বা এবং সংযত-চিত্ত ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দেওঘরে এক ধনীগৃহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া আহারে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ প্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, ও পেয় আহার্য্য দর্শনে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সরল শিশুর ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৃহকর্ত্রী ভাবিয়াছিলেন, 'স্বামিজী আজ আকণ্ঠ ভোজন করিয়া আমাদের নিমন্ত্রণ সার্থক করিবেন।' কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই

---

* "মহাপুরুষজীর কথা" ও "মহাপুরুষজীর পত্র" (প্রকাশক—উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা)। "শিবানন্দের অনুধ্যান"—লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিল। শিবানন্দজী কোন কোন দ্রব্যে মাত্র অঙ্গুলি ডুবাইয়া তাহা জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'চমৎকার হয়েছে'। তিনি স্বল্পাহার করিয়া আসন ত্যাগ করিলেন। সত্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"জিতং সর্ব্বং জিতে রসে"। বোধ হয়, আহার-সংযম তাঁহার অশীতিবর্ষাধিক সুদীর্ঘ জীবন লাভের একটী কারণ।

শাস্ত্রমতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব স্মৃতি ও পূর্ব্ব সংস্কার বিলুপ্ত হয়। "অমনীভাব" বা "মনোনাশ"ই জীবন্মুক্তি। মনের পরপারে যাইবার কৌশল রাজযোগেও বিবৃত আছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব এত বাহ্যজ্ঞানহীন এবং অন্তর্মুখীন ছিলেন যে, গোপালকে ব্রজবালক, গঙ্গাকে যমুনা এবং নিত্যানন্দকে বলরাম ভ্রম করিয়াছিলেন। দিব্যোন্মাদের সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও জাগতিক স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ যখন সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সত্যলাভের জন্য সংকল্প করিয়া তপস্যামগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহারও উক্ত অবস্থা লাভ হইয়াছিল। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের অবস্থান সংবাদ পথিকদিগের নিকট পাইয়া পিতা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের বাল্য-বন্ধু ও মন্ত্রী-পুত্র উদঙ্গীকে পুত্রের কুশল সংবাদ আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। উদঙ্গী আসিয়া বুদ্ধদেবকে বলিলেন, "সিদ্ধার্থ, আমি তোমার বাল্য-সখা উদঙ্গী। তোমার পিতা রাজা শুদ্ধোদন তোমার জন্য ব্যস্ত। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর।"

গৌতমের শুধু যে পূর্ব্ব স্মৃতি লোপ পাইয়াছিল তাহা নহে; তাঁহার নিজ নাম পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল না। তিনি বলিলেন—"সিদ্ধার্থ কে? শুদ্ধোধন কে? এবং উদঙ্গী কে?"

জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শিবানন্দের সাংসারিক সম্বন্ধ-স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তখন কাশীবাসিনী। তিনি যখন শেষবার কাশী গমন করেন, তখন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারিগণ 'পিসীমা' বলিয়া

সম্বোধন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিও তাঁহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। একদিন শীতের সময় সকাল বেলায় মহাপুরুষজী শিষ্যস্থানীয় সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নির্বাক ও নিস্পন্দ। তাঁহার ভগিনী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার এই ছোট ভাইটিকে লালনপালন করিবার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু সে আজ আমার সহিত আলাপ করিতে চাহে না।" মহাপুরুষ মহারাজ তাহাতে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাবা, দেখ পাঁচ বছর পূর্ব্বে এঁকে দেখ্‌লে মনে হত যে, এঁর সঙ্গে কখনও কোন পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন রাস্তার কোনও অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত উঁহার কোনও পার্থক্য দেখি না। তোমরাই ত আমার মা, বাপ, ভাই, বোন সব।" শিবানন্দ মহারাজ ঐহিক সম্পর্কের স্মৃতি এমন ভাবে মুছিয়া ফেলিয়া ছিলেন যে, তাঁহার রক্ত-সম্বন্ধেরও স্মৃতি পর্য্যন্ত ছিল না। ইহাই প্রকৃত 'বিদেহাবস্থা'। কেবল বরিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানিগণেরই এইরূপ উচ্চাবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

শিবানন্দজী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ন্যায় নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি "Light of Asia" বইখানি পড়িতে খুব ভালবাসিতেন। ভগবান বুদ্ধের মত উদাসীনতা তাঁহার মধ্যে এত মূর্ত্ত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে এই জগতের লোক বলিয়া মনে হইত না। বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে, ডান পায়ের আঙ্গুল হইতে এক গজ দূরে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে খুব ধ্যান হয়। শিবানন্দজী চলিবার সময়ও পথ-নিবদ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যান করিতে করিতে চলিতেন। স্বীয় ধ্যানপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মহাব্যোম বা মহাশূন্যের ভিতর চুপ করে বসে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম ধ্যান করি, কোনও চিন্তা মনে উঠ্‌তে দিই না, দ্রষ্টা বা সাক্ষী রূপে থাকি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার সগুণ স্থূলস্বরূপ

জ্ঞানে ধ্যান করিতেন ; এবং কোন কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জপ ও মূর্তি ধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি আমিত্ব এমন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিত্ব হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিতেন এবং চিন্তায় ও কাজে তাহা প্রকাশ করিতেন। জিশুখ্রীষ্টের ন্যায় তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে সদা বিরাজমান। গীতায় আছে, সর্ব্বভূতের ভিতরে ভগবান অধিষ্ঠান করেন, শিবানন্দজী তাহা স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একবার তিনি দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে গিয়াছিলেন। বিদ্যাপীঠের অনতিদূরে 'বিপিন কুটীরে' অবস্থানকালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় সাধুব্রহ্মচারিগণ একদিন প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। জনৈক সাধু প্রণামান্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—"স্বামিজী, আমার মনে হয়, আপনারা আমাদের স্তোকবাক্য দিয়ে কাজকর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু ভগবান লাভ করবার জন্য আমাদের সাধনভজন করতে হবে।" তিনি তাহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া শিষ্যকে খুব বকিলেন এবং বলিলেন, "আরে, একি আমি বল্ছি, আমার মুখ দিয়ে ৺ঠাকুর বল্ছেন। আমার মধ্যে আমি নাই, সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরই জাগ্রত ও জীবন্ত রয়েছেন। আমাদের মুখ দিয়ে তিনি যা বলেন তা বিশ্বাস করো, পূর্ণ (perfect) হ'য়ে যাবে। কবে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি অবতার এসেছিলেন কে জানে! এই সেদিন তিনি এলেন, তাঁর কথা বিশ্বাস করো আর চিন্তা করো, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না, তোমাদের দেবত্বলাভ হবে।"

শিবানন্দজী এত গম্ভীর ও স্বল্পভাষী ছিলেন যে, তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে সাহস করিত না। বাহিরের লোকে ত দূরের কথা, তাঁহার নিত্যসঙ্গী শিষ্য ও সেবকগণও নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ ছিল জলের দাগের মত! পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে জলন্ত অগ্নির মত যিনি ক্রুদ্ধ ছিলেন পর মুহূর্ত্তে তাঁহাকে নবনীর

মত কোমল দেখা গিয়াছে। একবার তিনি কোন শিষ্যকে ভীষণভাবে গালমন্দ করায়, শিষ্য অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়া তাঁহার দিকে আর যানই না, অথচ সেদিন কোন ধনী ভক্তের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। সময় অতিক্রান্তপ্রায়, শিষ্য ভয়ে অত্যন্ত জড়সড় হইয়া শিবানন্দজীর সম্মুখে এই সংবাদ প্রদান করিতে উপস্থিত। শিবানন্দজী তখন সহাস্যমুখে শিষ্যটীর সহিত এমনভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি যে উক্ত শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা মনেই হইল না। সত্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "সাধু প্রকোপিত হইলেও তাঁহার মনে কোন বিকার উপস্থিত হয় না। তৃণের অগ্নি যেমন সাগরের জলকে উত্তপ্ত করিতে পারে না, ক্রোধ তদ্রূপ সাধুকে অভিভূত করিতে পারে না।"

শিবানন্দজীর দেহাত্মবুদ্ধি আদৌ ছিল না। তিনি দেহের যত্ন আদৌ লইতেন না। তপস্যাকালে সমস্ত রাত্রি প্রজ্বলিত ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং দিনের বেলায় গঙ্গায় তিন ডুব দিয়া আহারে বসিতেন। ইহাতে ধুলো কাদায় তাঁহার শরীরে একটা মলিন আবরণ পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার গায়ের ফর্‌সা রং এত ঢাকিয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারা যাইত না। তাঁহার পা ফাটিয়া রক্ত পড়িত, দাড়ি ও মাথার চুল জটা পাকাইয়া ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ঋষিপ্রতিম ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত একবার তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাঁহার শরীর ভালরূপে ধুইয়া তৈল মাখাইয়া দেন।

তিনি খুব উজ্জ্বল-বর্ণ ছিলেন না; কিন্তু তপস্যালব্ধ জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল সদা উদ্ভাসিত থাকিত। ধ্যান করিবার পর ঠাকুরঘর হইতে যখন তিনি বাহির হইতেন তখন তাঁহার বর্ণ এত উজ্জ্বল হইত যে, পরিহিত গেরুয়া বস্ত্রের বর্ণের সহিত তাহা এক হইয়া যাইত। শেষ বয়সে তিনি হাঁপানিতে অতিশয় কষ্ট পাইতেন, কিন্তু রোগ কখনো তাঁহাকে মুহ্যমান ও নিরানন্দ করিতে পারিত না। একবার তিনি যখন দেওঘরে অবস্থান

করিতে ছিলেন তখন তিনি হঠাৎ কঠিন হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। রাত্রে তিনি হাঁপানীতে এত কষ্ট পান যে, আদৌ ঘুমাইতে পারিলেন না, সারারাত্রি বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া কাটাইলেন। প্রাতঃকালে সাধুগণ যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া কুশল প্রশ্ন করেন, তখন তিনি ভগবদ্ ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার ত কোনই কষ্ট হয় নি। আমি বেশ জানি যে, আমি শরীর নই। শরীরটা আমা হতে তফাৎ, আমার কষ্ট হবে কি করে? সারারাত্রি তাঁর ধ্যানে ডুবে আছি।" তখন তাঁহার মুখে অসুখজনিত কোন কালিমার দাগ ছিল না।

নিজের ঠিকুজিখানি তিনি সাধু হইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। জন্ম তারিখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "আমি আনন্দস্বরূপ আত্মা, আমার আবার জন্মমৃত্যু কি? আম-ই বিক্রী হইয়া গেল, আর ঝুড়ির কি দরকার?" তাঁহার জীবন তপস্যাময় ছিল। তিনি এত অভিমানশূন্য ছিলেন যে, কোন উৎসবের সময় স্থান ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিবার আবশ্যক হইলে তিনি নিজেই অপরের জুতাগুলি কোলে করিয়া সরাইয়া অন্যত্র রাখিতেন। মানুষকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা ও ভালবাসা তিনি উৎকৃষ্ট সাধন মনে করিতেন। একবার তিনি গঙ্গাপূজা করিতে গিয়া স্নান-নিরত একটী লোকের মাথায় ফুল ও মুখে মিষ্টি দিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। তিনি বলিতেন, 'গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ-পূজা বড়।'

একবার স্বামিজীর জন্মোৎসবের রাত্রে কলিকাতা হইতে আগত জনৈক যুবক কর্ম্মীর বমি ও উদরাময় হয়। তিনি তাহাকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া আরোগ্য করেন। শিবানন্দজী মুক্ত ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তাই শুচি ও অশুচি, বিধি ও নিষেধ মানিতেন না। একবার কাশীতে গ্রহণের সময় তাঁহার কয়েকজন শিষ্য গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাদের জপধ্যান করিয়া রাত্রি কাটাইতে উপদেশ দেন। তাঁহার দীক্ষা-দান প্রণালীতেও অনুষ্ঠানের বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। দীক্ষাদান বিষয়ে

তিনি বলিতেন যে, ঠাকুরই একমাত্র গুরু, তিনি গুরু নন। দীক্ষাদান অর্থে তিনি আশ্রিত জনকে ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করাই বুঝিতেন। অবিশ্বাসী শিষ্যদের তিনি বলিতেন, "তোমাদের আমি ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়াছি এবং তিনিও তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়রূপে জানি। ইহার অধিক কিছু জানি না বা বুঝি না।" ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে গুরুই শ্রেয়োকামী মধ্যস্থ। শিবানন্দজী গুরু হইয়াও গুরুগিরি করেন নাই।

১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের প্রথম নূতন গৃহে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা উৎসবে মহাপুরুষজী তথায় গিয়াছেন এবং উইলিয়ামস্ টাউনে বিপিন কুটীরে অবস্থান করিতেছেন। তথায় তিনি সর্বদা সদানন্দে বিভোর আছেন, সহাস্যে কথাবার্তা বলেন এবং বিদ্যাপীঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে সকালে ও সন্ধ্যায় বেড়ান। কোন নবীন ব্রহ্মচারীর বাড়ী হইতে চিঠিপত্র আসিতেছে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য। ব্রহ্মচারীর মন এই চিন্তায় আন্দোলিত থাকিলেও মুখ ফুটিয়া স্বীয় গুরু শিবানন্দজীকে কিছু বলেন নাই। গুরু শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, "খুব জেঁকে বসে থাক। বাড়ীর কথা শুনো না বাবা।"

বেলুড় মঠে যোগদানের কিছুদিন পরে আমার বাড়ী হইতে তার আসিল, "মা কঠিন অসুখে শয্যাশায়িনী। অবিলম্বে বাড়ী এসো।" তারটী মহাপুরুষজীকে দেখান হইল। মহাপুরুষজী তখন স্বীয় কক্ষে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। তিনি তারখানি হাতে করিয়া কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বলিলেন, "মিথ্যা সংবাদ। বাড়ী যেও না।" শিবতুল্য শিবানন্দ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও যোগশক্তিশালী ছিলেন। পরে খবর লইয়া জানা গেল, সত্যই তারের সংবাদ মিথ্যা। যেদিন বেলুড় মঠে আমাদের সন্ন্যাস হয় সেদিন তাঁহাকে শিবময় দেখিয়াছি। শিবরাত্রির দুই দিন পরে ঠাকুরের তিথিপূজা। শিবরাত্রিতে মঠে সারারাত্রি পূজা, ভজন ও

নৃত্য হইল। সেদিন হইতেই মহাপুরুষজী ভাবে মাতোয়ারা রহিলেন। তিথিপূজার রাত্রিশেষে আমাদের সন্ন্যাস হইল। আমরা সেদিনও উপবাসী ছিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি সন্ন্যাস দানকালে বলিলেন, "সব শিবময়।" একটু পরে আবার বলিলেন, "সব ক্ষুধিত। এদের প্রসাদ দাও।"

কলম্বো যাত্রার পূর্বে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তিনি শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমি ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে করযোড়ে নিবেদন করিলাম, আপনাদের আদেশে আমি কলম্বো আশ্রমের কর্মী হয়ে যাচ্ছি। তিনি বলিলেন, "বেশ ভাল। তোমাদের পূর্বে ঠাকুর সেখানে গেছেন। যতই তাঁর চিন্তা করবে এবং তাঁর হাতের যন্ত্র বলে নিজেকে ভাববে ততই তাঁর কাজ হবে। আমি সেখানে বৎসরখানেক ছিলাম। তাঁর ধ্যান করেই কাটিয়ে দিয়েছি। ও রাক্ষসের দেশ। সাবধানে থেকো বাবা।" আমি—ঋষিকেশে যাবার ইচ্ছা ছিল তপস্যার জন্য। শিবানন্দজী—যেখানে থাকবে সেটাকে তপস্যার দ্বারা ঋষিকেশ কর। তোমরা যেখানে থাকবে সেখানেই তপোবন হবে। তুই ইংরাজি জানিস্? আমি—আজ্ঞে হাঁ, সামান্য। তিনি—আচ্ছা, কোন চিন্তা নাই। ঠাকুরের কৃপায় তোর মুখে হাতে সরস্বতী বস্‌বেন। তোর সব খুলে যাবে।" স্থূল শরীরে তাঁহাকে আমার এই শেষ দর্শন।

ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখিতেছিলেন তখন স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠের সংঘগুরু। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন স্বরূপ কোন ঘটনা স্বীয় জীবন হইতে লিখিবার জন্য রোমাঁ রোলাঁ শিবানন্দজীকে পত্র দেন। শিবানন্দজী তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন, ঠাকুর আমাকে স্পর্শ মাত্র তিন বার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন।

স্বামী শিবানন্দ যখন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ তখন বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি পি. সি. লায়ন বেলুড় মঠ দেখিতে আসেন। লায়নকে তখন

সকলে ভীতির চক্ষে দেখিতেন। মহাপুরুষজী লায়নকে সম্বর্দ্ধনাতে মৃদু হাস্যে বলিলেন, "মিঃ লায়ন, এখন আপনি পিঞ্জরের বাহিরে এসেছেন।" লায়ন সন্ন্যাসীর কৌতুকে খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "হাঁ স্বামী, আমি ত পিঞ্জরের বাহিরে আসিতে ইচ্ছা করি।" জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কিরূপ নির্ভীক ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন তাহা উক্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

বেলজিয়ামের রাজা আলবার্ট বেলুড় মঠ দেখিতে আসিয়া স্বামী শিবানন্দজীর সহিত আলাপান্তে বলিয়াছিলেন, "জীবনে সর্বপ্রথম এমন একটী লোককে দেখিলাম, যাঁর সঙ্গে মানুষভাবে মানুষের মত কথা বলা যায়।" উতকামণ্ডে অবস্থানকালে মহীশূরের মহারাজার আমন্ত্রণে শিবানন্দজী স্থানীয় রাজপ্রাসাদে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে উক্ত রাজ্যের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজার কক্ষে উপস্থিত হইয়া শিবানন্দজী সাধুসুলভ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার স্নানাগার কোথায়?" মূত্রত্যাগের উদ্দেশ্যেই তিনি এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহারাজা শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণের সরল স্বভাবের সহিত পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন, মহাপুরুষজীকে স্নানাগারে লইয়া যাইবার জন্য।

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে স্বামী শিবানন্দ ভূমার দর্শন লাভ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে ভূমা বলা হইয়াছে। একদা শিবানন্দজী যখন অসুস্থ তখন তাঁহাকে ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে ডাক্তারের আগমন-সংবাদ দেওয়া হইল। দেহজ্ঞানরহিত মহাপুরুষজী বলিলেন, "আমি ত খ। আমাকে ডাক্তার আর কি দেখবেন?" ডাক্তার আসিয়াছেন তাঁহার দেহ দেখিতে; কিন্তু তাঁহার ত দেহবোধ আদৌ নাই।

বরাহনগর মঠে স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ 'দানাদের ঘরে' একটি বড় মশারী খাটাইয়া ঢালা বিছানায় সকলে একত্রে শুইতেন। তখন

তাঁহাদের কাহারো পৃথক্ বিছানা ছিল না। একদিন রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শিবানন্দজীর পাশে শুইয়া আছেন। শিবানন্দজী ধ্যান করিবার জন্য গভীর রাত্রে উঠিয়া দেখেন, মশারী দিব্যালোকে উদ্ভাসিত এবং বিবেকানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের পরিবর্তে কতকগুলি জটাধারী শ্বেতকায় বালশিব শায়িত আছেন। প্রথমে শিবানন্দজী উক্ত দর্শনকে দৃষ্টিভ্রম মনে করিলেন; কিন্তু উহার গভীরার্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় চক্ষুদ্বয় রগড়াইলেন, কিন্তু পূর্ব দর্শন চলিতে লাগিল। তিনি সারারাত্রি ধ্যানে কাটাইয়া ভোরে দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, বালশিবগুলি অন্তর্হিত এবং তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ পূর্ববৎ শায়িত। প্রাতে তিনি উক্ত ঘটনাটি সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং ইহা শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মৃদু হাসিয়া নীরব রহিলেন। পরবর্তী কালে শিবানন্দজী যখন কাশীর বীরেশ্বর শিবের ধ্যানটি পড়িলেন তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার উক্ত দর্শন সত্য। কারণ, বিবেকানন্দ স্বামিজী বীরেশ্বর শিবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। বীরেশ্বরের ধ্যানটি এই—

বিভূতিভূষিতং বালম্ অষ্টবর্ষাকৃতিং শিশুম্।
আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুবক্তৃ দশনচ্ছদম্॥
চারুপিঙ্গজটামৌলিং নগ্নং প্রহসিতাননম্।
শৈশবোচিতনেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্॥

অর্থাৎ—বীরেশ্বর শিব আট বৎসর বয়স্ক বালকের মত। তাঁহার দেহ নগ্ন ও ভস্মলিপ্ত, চক্ষুদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত। তাঁহার মুখমণ্ডল ও দন্তরাজি সুন্দর, মস্তক জটামণ্ডিত ও বদন হাস্যস্ফুরিত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বালসুলভ অলঙ্কারে সুশোভিত।

ঠাকুরের পার্ষদগণের একখানি ফটো মঠবাড়ীর দেওয়ালে টাঙান ছিল। শিবানন্দজী উক্ত ফটোর মধ্যে স্বীয় ছবি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে এ কোন্ শালা? সাধুদের সঙ্গে থেকে থেকে এও সাধু হয়ে

গেছে।" স্বীয় ঈশ্বরকোটি গুরুভ্রাতাদের প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এত বড় ছিলাম না। তবে ঠাকুরের কৃপায় এখন ঈশ্বরকোটি হয়ে গেছি।" ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষগণ নিত্যসিদ্ধ এবং অবতারগণের পার্ষদরূপে দেহধারণ করেন। তাঁহারা অবতারকল্প শক্তিসম্পন্ন। কেহ মহাপুরুষ শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেহপাতের পরে তিনি কোথায় যাইবেন। শিবানন্দজী ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তিনি রামকৃষ্ণলোকে যাইয়া ঠাকুরের নিত্য পার্ষদ হইবেন। অবতারের ন্যায় ঈশ্বরকোটিগণও জগদ্ধিতায় দেহধারণ করেন।

ছয়

'নারদ পঞ্চরাত্র' সম্বন্ধে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্ একটী প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আদি শাস্ত্র। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ইংরাজিতে ইহার যে সুন্দর সরল অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা ১৯২১ খ্রীঃ এলাহাবাদ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ইংরাজি পুস্তক ২৪৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও ইহার পরিশিষ্টে জার্মান পণ্ডিত ডাঃ এফ. ও. শ্রেডার লিখিত 'নারদপঞ্চরাত্রের ভূমিকা' আছে। ইহাতে মুদ্রিত আছে, "ইহা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ওরফে শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি. এ, এল. সি. ই. কর্তৃক অনূদিত।" জটিলাংশের ব্যাখ্যার্থ পণ্ডিত অনুবাদক প্রায় ত্রিশটী পাদটীকা দিয়াছেন। সেইগুলিতে সাধন-রহস্য, মন্ত্রতত্ত্ব ও দেবতাতত্ত্ব প্রভৃতির নিগূঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুস্তকের প্রথমে অনুবাদক যে সুচিন্তিত ভূমিকা দিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

---

* স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজি হইতে অনূদিত।

"এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র পুস্তকে জ্ঞানামৃত-সারসংহিতা আছে। সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের ইহা একটী সুপ্রাচীন গ্রন্থ। ইহাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃষ্ণ-তত্ত্ব, গোপাল-তত্ত্ব এবং রাধা-তত্ত্ব ইহাতে বিবৃত। ইহার মতে শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস ও ভক্তি অবশ্য কর্তব্য। ইহাতে ব্যূহসমূহও উল্লিখিত আছে; কিন্তু তত নিশ্চিত ভাবে নহে, যেন সেগুলি অত্যন্ত আবশ্যকীয় নয়। জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ এবং ইহলোক ও পরলোকের সমস্যা সমাধানে ইহা যত্নশীল। ইহার মতে শ্রীহরির প্রতি প্রধানতঃ শান্ত ও দাস্য-ভাব সাধন দ্বারা জাগতিক দুঃখ আত্যন্তিক ভাবে বিনষ্ট হয়। ইহাতে সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য ভাবের উল্লেখ আদৌ নাই। ইহাতে মানব-জীবনের চতুর্বর্গের মধ্যে প্রধানতঃ প্রথম তিনটি ব্যাখ্যাত। ইহার মতে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণের নিকট গমনই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বাস করেন। দ্রষ্টব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-লাভে সর্বলাভ হয়। যদিও উহাতে উল্লিখিত আছে যে, শিব নারদকে সব কিছুই বলিতেছেন, তথাপি বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ইহাতে প্রচারিত নাই। কিরূপে অগ্নিচয়ন করিতে হয়, কিরূপে প্রাণায়াম করিতে হয়, কিরূপে সোমরস প্রস্তুত ও পান করিতে হয়, এবং এইরূপে কিরূপে মন সমাহিত হয় ইত্যাদি যোগক্রিয়ার কথা শেষ দুই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত।"

"শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-প্রেম লাভই মুখ্য বিষয়। শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। কিন্তু ভগবদ্গীতাতে প্রচারিত ঈশ্বরতুল্য তিনি নহেন। পঞ্চরাত্রে যে ভক্তি বর্ণিত তাহা গোপীপ্রেমবৎ সমুচ্চ নহে। গোপ-গোপীগণের কৃষ্ণ-প্রেম বিশুদ্ধ ও স্বার্থগন্ধহীন। গোপ-গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের জীবন-সর্বস্ব বলিয়া জানিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিতেন, 'আমি সত্যই বলছি, যে তাঁকে চায় সেই পায়। যার বিশ্বাস আছে তার সব আছে। যে বিশ্বাস চায় সে সব পায়। সর্বস্ব ঈশ্বর-পদে অর্পণ করিলে

তুমি নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ করিবে। তখন তুমি অনুভব করিবে চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম।"

"বালক কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই পুস্তকে সংগীত। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং তাঁহাকে উপাসনার প্রণালী নারদ জানিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে শঙ্করের নিকট যাইয়া উপদেশ লইতে পরামর্শ দেওয়া হয়। নারদ কৈলাসে যাইয়া সপ্তদ্বারবিশিষ্ট শঙ্কর-পুরীতে প্রবেশ করেন। উক্ত দ্বারসমূহে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্রের দৃশ্য এবং গোকুলে বিভিন্ন বাল্যক্রীড়ার চিত্র অঙ্কিত আছে। কালিন্দীতটে কদম্ববৃক্ষে স্নানরতা গোপিকাগণের বস্ত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন, যমুনা হইতে নগ্না গোপিকাগণের প্রত্যাবর্তন, কালীয়দমন, হস্তে গোবর্ধন ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা এবং গোপিকাগণ ও পালক পিতাদির বিলাপ প্রভৃতি ঘটনা তথায় চিত্রিত আছে। ১৯১১ খ্রীঃ যোধপুরের নিকটে মান্দোর নামক স্থানে যে স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাতে উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কতিপয় ক্ষোদিত দেখা যায়। উক্ত স্তম্ভের বয়স চতুর্থ শতকের পূর্বে বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। দ্বার ও স্তম্ভাদিকে উক্ত প্রকার ভাস্কর্য্যের দ্বারা শোভিত করিবার প্রথা যখন সাধারণভাবে প্রচলিত হয় তখনই শিবপুরীর তোরণসমূহে এই সকল ভাস্কর্য্যের কল্পনা লেখকের মনে উদিত হয়। সুতরাং জ্ঞানামৃতসার চতুর্থ শতক অপেক্ষা প্রাচীন নহে। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব, উহা আরও আধুনিক। যে স্বর্গে শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন তাহার নাম গোলোক-ধাম। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন তাঁহারা গোলোকে যান। নারদ পঞ্চরাত্রে কতকগুলি মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে যেগুলি জপ করিলে জাপকগণ বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থমতে শ্রীহরির দাস্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। সাধন স্মরণ, নামজপ ও গুণকীর্তন, প্রণাম, পদাশ্রয়, ভক্তিভরে সতত অর্চনা এবং আত্মনিবেদন—এই ছয় প্রকারে হরিভজন করিতে হয়। ভাগবত পুরাণ হরিভজনের আরও তিনটি উপায় যোগ করিয়াছেন—যথা হরি-

গুণ শ্রবণ, দাস্য ও সখ্য। শেষ দুইটী আত্মনিবেদনের প্রাথমিক সোপান।"

"এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল নারীদিগকে ভালবাসিতেন শ্রীরাধা তন্মধ্যে সর্বোত্তমা ও প্রধানা। আদিদেবই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে আবির্ভূত। এই গোপিকাকে উচ্চ পদবীতে উন্নয়ন উক্ত সংহিতার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রিয়তমা চিরসঙ্গিনী রাধ'র উপাসনা প্রচারে আলোচ্য সংহিতা প্রধানতঃ পর্য্যবসিত। যে বৃহসমূহ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব সেগুলির উল্লেখ অত্যল্প, মাত্র কয়েকটী মন্ত্রে প্রদত্ত আছে। যে মতবাদ পরবর্ত্তী কালে বল্লভাচার্য্য প্রবর্তিত করেন তাহা এবং এই গ্রন্থে প্রদত্ত মতবাদ উভয়ই সম্পূর্ণ এক প্রকার। সুতরাং এই সংহিতা বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে লিখিত, অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে। এই সংহিতাকে রামানুজীয়গণ সন্দিগ্ধপ্রমাণ গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।

"দুই দেবতার কেবলমাত্র অভেদত্ব হইতে ঈশ্বরের অবতারত্ব পৃথক্। অবতার মানব বা এমন কি, পশু দেহ ধারণ করিলেও ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে প্রকটিত হয়। অবতারবাদে অভেদভাবের পরিণতি সহজ। সাকার দেহধারী পুরুষ নিরাকার দেবতার সহিত ঐক্যানুভব করেন। বৈদিক যুগে যে চিন্তাধারা কতিপয় বৈদিক দেবতাকে অগ্নির সহিত অভিন্ন ভাবিয়াছিল তাহাই এই অবতারবাদ প্রবর্ত্তনের মূলে বিদ্যমান। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতে নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবতারও বিভিন্ন।"

"নারায়ণীয় সংহিতার মতে অবতার ছয়টী—বরাহ, নরসিংহ, বামন, ভৃগুবংশীয় রাম, দাশরথী রাম এবং কংসবধার্থ আবির্ভূত বাসুদেব কৃষ্ণ। যে শ্লোকে ষড়াবতার বর্ণিত তাহার কিছু পরে আর একটী শ্লোকে দশাবতার উল্লিখিত। ইহাতে হংস, কূর্ম ও মৎস্য প্রথমে ও কল্কি শেষে

সংযোজিত হইয়াছে। কল্কির পূর্বে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নাম এই শ্লোকে সাত্বত। ভগবদ্‌গীতায় আছে—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীকৃষ্ণ অবতারশ্রেষ্ঠ ও ভগবানের ষোলকলার পূর্ণাবতার। অন্য নয়টী অবতার অংশকলা, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই সকল প্রধান অবতার ব্যতীত আরও অনেক ক্ষুদ্রাবতার গৃহীত। যথা—সনৎকুমার, নারদ, কপিল (যিনি আসুরীকে সাংখ্যদর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন), দত্তাত্রেয় (যিনি প্রহ্লাদ ও অলর্ককে আন্বিক্ষিকী এবং যদু ও হৈহয়কে যোগবিদ্যা শিক্ষা দেন), ঋষভ এবং সর্বশেষে আয়ুর্বেদের আদিগুরু ধন্বন্তরী। এত ব্যাপক ভাবে কৃষ্ণোপাসনার কারণ তাঁহার অবতারত্ব নহে। সাত্বতগণের মধ্যে যে ধর্মসংস্কার বা নবধর্ম প্রথমে উদ্‌ভূত হয় উহার অনুসরণকারীগণের অসাধারণ উপাস্য বলিয়া তিনি এই জনপ্রিয়তা লাভ করেন।"

"প্রধান দেবতাত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে ব্রহ্মা কখনো বিশেষ উপাস্যরূপে পরিগণিত হন নাই। কারণ, স্বীয় কন্যার উপর কামমূলক আক্রমণের জন্য তিনি নিন্দিত। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে—"স্বীয় পিতার প্রতি নারদ মুনি ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার পিতাকে এই অভিশাপ দিলেন, 'আপনার কেহ ভক্ত হইবে না। কারণ, আপনি অশাস্ত্রীয় কামের বশবর্তী হইলেন।' এইরূপে ব্রহ্মা উপাস্যপদ প্রাপ্তির অযোগ্য হওয়ায় অন্য দুই দেবতা শিব ও বিষ্ণু হিন্দুগণের পূজা উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। ইতিহাসাবলী ও পুরাণ-সমূহে লিপিবদ্ধ কয়েকটী আখ্যায়িকা হইতে মনে হয়, শিব এই দেশের আদিম অধিবাসিগণের দেবতা। আর্য্যগণ বা ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহাদের

প্রতিষ্ঠানসমূহের চিরশত্রু দৈত্য ও রাক্ষসগণ শিবের উপাসক। এই দেশের আদিম অধিবাসিগণকে দৈত্য বলা হইত। ব্রাহ্মণগণ দৈত্যদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের উপাস্য দেবতা শিবের প্রতি ছিলেন না। অন্য পক্ষে দৈত্যগণ ব্রাহ্মণগণের উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর উপাসনার অতিশয় বিরোধী ছিল। কংস, হিরণ্যকশিপু, রাবণ এবং অন্যান্য আর্য্যারিগণ বিষ্ণুবিরোধী হইলেও অনুরক্ত শিবোপাসক ছিলেন।"

"বিষ্ণু সুসভ্যতা ও সংস্কৃতির দেবতারূপে পরিগণিতা। ইহা লক্ষ্যণীয় যে, শঙ্কর বা শিব প্রতিদ্বন্দ্বী বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইলেন। মহাভারতে এই আশ্চর্য্য ঘটনাটী উল্লিখিত আছে যে, একদা নারদ আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। দেবর্ষি সুমেরু পর্বতের শিখর হইতে দেখিলেন, ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর দিকে শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত। তিনি সেই অভিনব দেশে গমনপূর্বক বিষ্ণুর অদৃষ্টপূর্ব দর্শনলাভ করিলেন। শ্বেতদ্বীপ-বাসী একান্তিনগণ ব্যতীত অন্য কেহ অন্যত্র উক্ত দর্শন লাভে ধন্য হন নাই। শ্বেতদ্বীপের ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে একদল পণ্ডিতের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, 'এই ঘটনায় কয়েকজন ব্রাহ্মণের খ্রীষ্টান দেশে গমন সূচিত। সেই দেশ হইতে এই মতবাদ প্রচারিত হয় যে, বিষ্ণুর অবতার বা অন্য কোন ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করিলে মুক্তি হয়।' অন্যান্য পণ্ডিতগণ ইহার প্রতিবাদপূর্বক বলেন, "বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এদেশে আমদানি অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত উপাখ্যানের সম্ভাবনা একান্তিন সম্বন্ধে হইতে পারে—এ কথা কোন পণ্ডিতই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাহারা মধ্য এশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অধিবাসী মুসলমান বলিয়া কোন পণ্ডিত অনুমান করেন।

"দক্ষিণ ভারতে এই মতবাদ প্রচারিত হয় যে, বিষ্ণুর প্রধান ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস রাখিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। বিষ্ণুতে বিশ্বাস মুক্তির একমাত্র উপায়—এই মতবাদ প্রচারোদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ রামানুজ যে ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপন

করেন উহার পীঠস্থানরূপে অদ্যাপি কাঞ্চী বিবেচিত। এই অভিনব ধর্মমত প্রচারের কয়েক শতক পূর্বে দক্ষিণ ভারতে যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল উহা কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদপূর্বক 'বিশ্বাসে মুক্তি' এই মত প্রচার করেন। বিষ্ণুবাদ সকল শ্রেণীর লোকের নিকট মুক্তিধর্ম প্রচার করিল, এমন কি যবন বা ম্লেচ্ছগণও বাদ যায় নাই। উচ্চ বর্ণের সেবাই শূদ্রকর্ম বলিয়া আদিম ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণকে ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার দেন নাই। বৈষ্ণবগণ শূদ্রগণকে শুধু ধর্মসম্প্রদায়ে স্থান দিয়া ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তাঁহারা যে সকল শূদ্রকে পাণ্ডিত্য ও তপস্যার বলে শ্রদ্ধেয় দেখিলেন তাঁহাদিগকে ধর্মগুরু বা ধর্মশিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবশ্য এখন ইহা সর্ববাদীসম্মত যে, খ্রীষ্টানধর্মের, বস্তুতঃ পৃথিবীর আধুনিক সকল ধর্মেরই মূল উৎস প্রাচীনতম ধর্ম—হিন্দুধর্ম। কিন্তু উক্ত ভাব গ্রহণে অসামর্থ্যহেতু তাঁহারা এখন ভীষণ জড়বাদী হইয়াছেন। অবশেষে তাঁহারা নিশ্চিতই এই চিরউদার হিন্দুধর্মমত গ্রহণ করিবেন।"

ভূমিকার অনুবাদ এখানে সমাপ্ত হইল। নারদ পঞ্চরাত্রের ইংরাজি অনুবাদের স্থানে স্থানে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যে সকল সারগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ মন্তব্য দিয়াছেন সেগুলির অনুবাদ এক্ষণে প্রদত্ত হইতেছে।—

"মহাভক্তের লক্ষণ কি কি? বৈষ্ণবগণের মধ্যে তাঁহাকেই মহাভক্ত বলা হয় যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে আনন্দ ও আস্বাদ পান, আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেন এবং যাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হয়, যিনি কায়মনোবাক্যে জানেন তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি সকল স্বজন শ্রীহরির, এবং সকল প্রাণীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি-জ্ঞানে যিনি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন।"

"নারদ পঞ্চরাত্রের একটী শ্লোকে আছে, হরিভক্তিই সকল তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেখানে শ্রীহরি পূজিত হন সেখানে তপস্যানুষ্ঠানের সমুদয় ফল উপস্থিত হয়। কিন্তু শুধু তপস্যায় লক্ষ্যে পৌছান যায় না, যদি হরিপূজা না থাকে। আবার হরিপূজা কি? হরিকে অন্তরে বাহিরে

দেখা, বিশ্বের সর্বত্র এবং সকলের হৃদয়ে তিনি বিরাজিত ইহা প্রত্যক্ষ করাই প্রকৃষ্ট হরিপূজা। প্রাণ হরি, সূর্য্য হরি, চন্দ্র হরি, হরিই পরমাত্মা, সবই হরি। এইরূপে হরিভজনই প্রকৃষ্ট তপস্যা। সুতরাং কৃচ্ছ্রতা ও অন্য প্রকার কঠোরতার দিকে অযথা দৃষ্টিদান অনাবশ্যক। ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি-প্রেমে মগ্ন হওয়াই একমাত্র কর্তব্য। প্রেম, প্রেম, প্রেমই এই জগৎ ও দেহের সারবস্তু। ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রীতির সাধন দ্বারাই জীবন সার্থক হয়।”

“লক্ষ্মীবীজ শ্রীং, মায়াবীজ হ্রীং ও কামবীজ ক্লীং। স্বাহা ব্রহ্মার শক্তি। যে মন্ত্র সকল সাধনের মূল তাহাই বীজমন্ত্র। বীজমন্ত্র জপের দ্বারা রাধাশক্তি জাগ্রতা হন, অর্থাৎ মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী শক্তি মস্তকে সহস্রারে উত্থিতা হন। প্রণব ওঁ। মহামায়া মন্ত্র হ্রীং, রাধা মন্ত্র রাং, লক্ষ্মী মন্ত্র শ্রীং, সরস্বতী মন্ত্র ঐং; অনলবীজ স্বাহা। সম্পূর্ণ বীজমন্ত্রটী এই—ওঁ হ্রীং রাং শ্রীং ঐং কৃষ্ণপ্রাণাধিকায়ৈ স্বাহা। মন্ত্র শব্দ-শৃঙ্খল মাত্র। মন্ত্রজপ ততদিন নিষ্ফল যতদিন মন্ত্রদেবতার সহিত চিত্ত সংযুক্ত না হয়। সাধনই এই সংযোগের উপায়। মন্ত্রসমূহ মাতৃকা শক্তির বিভিন্ন শব্দ শরীর। হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্যোতির যে স্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত আছে তাহার চারি দিকে প্রসুপ্তা কুণ্ডলীকৃতা সর্পিণীর ন্যায় সেই মাতৃকা শক্তি প্রাকৃত মানবে অন্তর্নিহিতা। এই জ্যোতিঃকণা তাঁহার উপর একাগ্র করিলে তিনি জাগ্রতা হন। তখন সেই কুণ্ডলীকৃতা শক্তি সরল ঋজু হন। সেই শক্তি আয়ত্ত হইলে মানুষ মন্ত্রবীর্য্য লাভ করেন। মন্ত্রবীর্য্য লাভের বহু পূর্বে তিনি মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ও কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করেন। ইহাকে মিতাসিদ্ধি বলে। কিন্তু যখন পরা জ্ঞান লাভ হয় তখন তিনি খেচরী অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা পরশিবের অবস্থা। মন্ত্রচৈতন্য এবং মন্ত্রাক্ষর ও শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। মাতৃকা-চক্র উক্ত শক্তিসমূহের সমষ্টি।”

“ওঁ রাং রামায় স্বাহা—সপ্তাক্ষর মন্ত্র। কুণ্ডলিনী রাধা-শক্তি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবারতা। ভ্রূযুগলের ঊর্ধ্বে ললাটাংশ শিবস্থান। অঙ্গন্যাসকালে

বলিতে হয়—ললাটে পং পরায় মন্ত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ, নং পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ ইত্যাদি।"

"তত্ত্বন্যাসের পর প্রাণায়াম করিতে হয়। মন্ত্র-প্রাণায়াম ও যৌগিক প্রাণায়াম উভয়ই কর্তব্য। দশাক্ষর মন্ত্রে প্রাণায়ামকালে ২৮ বার রেচক করিতে হয়। তৎপূর্বে বাম নাকে পূরক ও তদন্তে কুম্ভক। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে প্রাণায়ামের সময় দ্বাদশ বার রেচক বিহিত। একটীর পর একটী কামবীজ ব্যবহারপূর্বক পৃথক্ পৃথক্ রেচক করিতে হয়। পূরকে সাত বার এবং কুম্ভকে বিশ বার মন্ত্রোচ্চারণ কর্তব্য। সকল কৃষ্ণমন্ত্রের প্রাণায়ামকালে কামবীজ ক্লীং ব্যবহৃত হয়। সর্বপ্রকার মন্ত্রে বর্ণানুক্রমিক জপান্তে প্রাণায়াম অভ্যাস বিধেয়। ইহার নাম মন্ত্র-প্রাণায়াম।"

"এখন যৌগিক প্রাণায়াম বর্ণিত হইতেছে। বাম নাকে ৩২ মাত্রায় পূরক কর। তারপর ৬৪ মাত্রায় কুম্ভকান্তে ডান নাক দিয়া ১৬ মাত্রায় রেচক কর। এক মাত্রার পরিমাণ এক (১) উচ্চারণ কাল। বাম হাত দিয়া বাম হাঁটু বেষ্টন করিতে যতক্ষণ লাগে ততটুকু সময়কে এক মাত্রা বলে। প্রাণায়াম দুই প্রকার—সগর্ভ ও নিগর্ভ। যে প্রাণায়ামে মন্ত্রোচ্চারণ বা মাত্রাগণন করা হয় তাহা সগর্ভ। যাহা এতদ্ব্যতীত তাহা নিগর্ভ। প্রাণায়াম সহায়ে সর্বোচ্চ তত্ত্বদর্শন হয়। প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ তপস্যা। প্রাণায়াম দ্বারা সর্বোচ্চ জ্ঞান ও সর্বোচ্চ দর্শন লাভ করা যায়। প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ যোগ ও সাধককে উচ্চতম আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করে। এক বৎসর প্রাণায়ামাভ্যাসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যে চিত্ত-মল দ্বারা জীবাত্মা আবৃত তাহা প্রাণায়ামের দ্বারা অনায়াসে বিনষ্ট হয়। প্রাণায়াম ব্যতীত সকল সাধন নিষ্ফল। প্রাণায়ামের প্রথমে ও শেষে উভয় নাকে নিশ্বাস বহে। বাম নাকে পূরকান্তে কুম্ভক ও তদন্তে ডান নাকে রেচক করিলে একটী প্রাণায়াম হয়। একটী প্রাণায়ামে ৩২ বার মন্ত্রোচ্চারণ কর্তব্য। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ১৬ বার প্রাণায়াম করিতে হয়।

"প্রাণায়ামান্তে পীঠন্যাসাদি করিতে হয়। যে আত্মা অধিকতর অন্তরে থাকেন তিনি অন্তরাত্মা। ইনি মনোময়, তৈজস এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইঁহার বীজাক্ষর অ। এই বীজাক্ষর দ্বারা ন্যাস করিতে হয়। এই বর্ণন্যাসে সকল ইন্দ্রিয়-কার্য্য বন্ধ হয় এবং মন শুদ্ধাবস্থায় থাকে। পরমাত্মার বীজমন্ত্র প। তিনি সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। বাসুদেব জ্ঞানাত্মা। তিনি অজ, প্রাজ্ঞ এবং বৃত্তিত্রয় বিনাশের পর চিৎসুখে অবস্থান করেন। পরা প্রকৃতি চিৎস্বরূপের কলা। ওঁ বীজমন্ত্র। অষ্ট প্রকৃতি অষ্ট প্রকার শক্তি।

"প্রত্যহ এই ন্যাস করিবে।—হৃৎমন্ত্র দ্বারা ভক্ত পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন ও দর্শন করে। শিখামন্ত্র দ্বারা সে দেহের রূপাদি হৃদয়ে টানিয়া লয়। বর্মমন্ত্র দ্বারা মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সম্বিৎস্বরূপ পরমাত্মায় স্থাপন করে। ইহা নেত্রসংজ্ঞা নামে অভিহিত। ইহার দ্বারা ভক্তের ত্রিবিধ দুঃখ দূরীভূত হয়।"

"কোন দেবতার পূজা করার অর্থ সেই দেবতায় পরিণত হওয়া। সেইজন্য পূজাকালে পূজক দেবতার আয়ুধাদি ব্যবহার করেন এবং নিজেকে সম্পূজ্য দেবতাস্বরূপ ভাবেন। পূজাতত্ত্ব অদ্বৈত ভাবের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।"

"ভক্তের দেহকে নিরাপদ ও সুদৃঢ় ও সাধনোপযোগী করাই ন্যাসের উদ্দেশ্য। দেহের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক লোমকূপকে দেবভাব সাধনের এমন উপযুক্ত করা চাই, যাহাতে বিশ্বের অঙ্গীভূত এই দেহ দেবময় হয়, মন দিব্য জ্ঞানে নিমজ্জিত হয়, প্রাণ আনন্দ-সাগরে অবগাহন করে এবং ভিতরে বাহিরে, বামে দক্ষিণে সর্বদিকে ব্রহ্মদর্শন লাভ করা যায়। সুমিষ্ট শব্দ বা সুর নির্গমনের জন্য যেমন বাদ্যযন্ত্রকে বাঁধিতে হয় সেইরূপ দেহ ও মনকে সাধনের অনুকূল করিবার জন্য ন্যাসাদি করিতে হয়।"

"বলবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা—একটী দশাক্ষর মন্ত্র। ওঁ শ্রীং ক্লীং গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় শ্রীং শ্রীং শ্রীং—একটী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। তারক ব্রহ্ম গোপাল নাম। তারক ব্রহ্ম গোবিন্দ নাম। তারক ব্রহ্ম রাম নাম। তারক ব্রহ্ম শিব নাম।"

"শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণাদি অবতার পুরুষগণের জন্মোৎসবদিনে এবং শিবরাত্রি প্রভৃতি শুভ বাসরে মহাপুরুষগণের জ্যোতির্ময় মূর্তি মানস চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দিবস অতি শুভ সময় বলিয়া পরিগণিত। কেন ?—কারণ, তখন আমাদের মধ্যে উচ্চতর মনের আবির্ভাব হয়। ইহা আনন্দ ও উল্লাসের বিষয়,—যখন জ্ঞান প্রসারিত, প্রেম পরিপুষ্ট এবং রিপুসমূহ প্রশমিত হয়। যাঁহারা উপরোক্ত মহোৎসবে যোগদান করেন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মন উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করে। আমাদের মন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ হউক। আমাদের শক্তি সমৃদ্ধ, আমাদের মিথ্যা ও দৈন্য অন্তর্হিত হউক। আমাদের সৎবুদ্ধি ও ঈশ্বরভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। আমরা যেন স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়বশ্যতাদি হইতে বিমুক্ত ও স্বাধীন হইতে পারি।"

সাত

‘দেবীভাগবত’ সম্বন্ধে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*

(১)

শ্রীমদ্ দেবীভাগবতম্ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। ইহা আঠার হাজার শ্লোকে সমাপ্ত এবং মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থের যে ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা এলাহাবাদ পাণিনি অফিস হইতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত। সমগ্র ইংরাজি অনুবাদ বার শত (১২০০) পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বিষ্ণুভাগবতের ন্যায় দেবীভাগবতও দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। স্বামী বিজ্ঞানানন্দকৃত ইংরাজি অনুবাদের প্রত্যেক খণ্ডে চারিটী করিয়া স্কন্ধ আছে। সুপণ্ডিত অনুবাদক স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত তিন খণ্ড পুস্তক ১৯৩২ খ্রীঃ ১২ই এপ্রিল বেলুড় মঠে পাঠাইয়া ছিলেন। বইগুলি বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে অদ্যাপি সযত্নে সুরক্ষিত।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রথম খণ্ডের প্রাগ্বাণীতে লিখিয়াছেন, “শ্রীমদ্ ভাগবত যেমন বৈষ্ণবদের নিকট আদরণীয় তেমনি দেবীভাগবত শাক্তদের নিকট শ্রদ্ধার্হ। ভাগবতদ্বয়ের পৌর্বাপর্য্যের প্রশ্ন প্রায়ই পক্ষপাতীর দৃষ্টিতে উঠে সুধী পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নহে। এই গ্রন্থের সমগ্র অনুবাদ প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মত প্রকাশ করিব না। আমার পরম সুহৃদ্ স্বর্গগত রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব আমাকে এই গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত করেন। সেইজন্য এই অনুবাদ তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত। তিনি এই ভাগবতদ্বয় উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দেবীভাগবতের রচনাকাল পূর্ববর্তী। তিনি বলিতেন, “অন্য ভাগবতটী আধুনিক রচনা এবং সম্ভবতঃ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রণেতা বোপদেব কর্তৃক রচিত।” স্বামী

---

* স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত।

বিজ্ঞানানন্দ প্রথম খণ্ডে যে তেরটী মন্তব্য বিভিন্ন স্থানে সংযোজিত করিয়াছেন সেগুলিতে শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব অভিব্যক্ত। মন্তব্যগুলির সরল অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"মন্ত্রশক্তি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করা ও অপরে সঞ্চারিত করা এবং মন্ত্রসিদ্ধির বিভিন্ন লক্ষণ প্রমাণিত করা প্রভৃতি পঞ্চবিধ বৈশিষ্ট্য আছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের।"

"ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের মধ্যে যাঁহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ নামে কথিত। তাঁহাদের অন্য নাম জ্ঞানঘন তুরীয়। তাঁহারা 'ওঁ হ্রীং' মন্ত্র দ্বারা সূচিত। মধ্যমশ্রেণীর জীবগণের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ আছে। তাঁহারা ব্রহ্মবৈশ্বানর, সূত্র ও হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। তৃতীয় শ্রেণীর জীবগণকে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলে। তাঁহারা ব্রহ্মের দেহস্বরূপ। পশু প্রভৃতিই নিম্নশ্রেণীর প্রাণী।"

"ইহা খুবই সম্ভবপর যে, সত্ত্বগুণী মানবগণ যে কোন সময়ে শুধু সত্ত্ব-গুণসম্পন্ন থাকেন না, কিঞ্চিৎ পরিমাণে রজঃ ও তমঃ গুণও সর্বদা তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী কালে তিনি রজঃপ্রধান হইতে পারেন। তখন তিনি এমন অবস্থায় পড়িতে পারেন যখন অর্থাদি আবশ্যক হয়। কিন্তু পূর্বের সত্ত্বপ্রাধান্যহেতু তিনি অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন না। সেইজন্য তিনি পরে কষ্টভোগ করেন। রজঃ সম্বন্ধেও তদ্রূপ ঘটে। কিংবা এইরূপও হইতে পারে। মনে করুন, কোন পরিবারের একটী উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সাত্ত্বিক। তাঁহার পরিবারের অভাব পূরণের জন্য যাহা আবশ্যক মাত্র তাহাই তিনি উপার্জন করেন। কিন্তু তাঁহার পরিবারভুক্ত নরনারীগণ আরও অর্থ চাহেন, কারণ তাঁহারা রাজসিক। স্বীয় সত্ত্বগুণের জন্য তিনি নিজে সুখী হইলেও তৎপরিবারের লোকেরা অসুখী হন। মানুষ যেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটী পত্নীর সহিত পরিণীত।"

"বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বীজমন্ত্র ঐং। চিতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ চিতা,

শবদাহের জন্য সজ্জিত কাষ্ঠস্তুপ। যে মূলাধারে কুণ্ডলিনী নামক অগ্নি যোগসাধন দ্বারা প্রজ্বলিত হন তাহাও চিতিশব্দবাচ্য হইতে পারে।”

“ইক্ষাকুর বংশধর এবং সূর্য্যবংশীয় রাজা শশদের পুত্র পুরঞ্জয়ের একটী নাম ককুদ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, অসুর-সংগ্রামে যখন দেবগণ প্রায়ই পরাভূত হইতে লাগিলেন তখন তাঁহারা ইন্দ্রকে পুরোবর্তী করিয়া শক্তিশালী রাজা পুরঞ্জয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধে মিত্র হইতে অনুরোধ করেন। পুরঞ্জয় এই সর্তে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন যে, ইন্দ্র তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। তদনুসারে ইন্দ্র বৃষরূপ ধারণ করিলেন এবং পুরঞ্জয় তাঁহার ককুদে আরোহণপূর্বক রণস্থলে যাইয়া সম্পূর্ণরূপে অসুরগণকে পরাজিত করিলেন। সেইজন্য পুরঞ্জয়ের একটি নাম ককুৎস্থ।”

“মন্ত্রমহোদধি নামক গ্রন্থে দেবীপূজার মন্ত্রগুলি দ্রষ্টব্য। সীতাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত। লঙ্কেশ্বর রাবণ কঠোর তপস্যার দ্বারা অলৌকিক শক্তিলাভ করেন। তিনি ত্রিভুবনে আধিপত্য স্থাপনপূর্বক নির্বিচারে কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রাবণ যে কর ধার্য করিয়াছিলেন ত্রিলোকের দেবাদি অধিবাসিগণ তাহা দিতে বাধ্য হইলেন। রাবণ বনবাসী ঋষি-মুনি-তপস্বীগণের নিকট দূত প্রেরণপূর্বক করদান করিতে আদেশ দিলেন। ঋষিগণ উত্তর দিলেন যে, তাঁহাদের কোন সম্পত্তি নাই। কিন্তু রাবণ তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না। তখন ঋষিগণ স্ব স্ব উরুদেশ কাটিয়া যে রক্ত দিলেন তাহা একটী পাত্রে লঙ্কায় রাবণের নিকট বাহিত হইল। রাবণ রক্তপূর্ণ পাত্রটী রাণী মন্দোদরীর নিকট জমা রাখিয়া বলিলেন যে, এই পাত্রে বিষ আছে এবং তিনি যেন উহা মুখে না দেন। কিন্তু কৌতূহল বশে মন্দোদরী উহার এক অংশ পান করিয়া গর্ভবতী হইয়া একটী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। রাবণের ভয়ে তিনি উক্ত পাত্র সহ নবজাত কন্যাটীকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। সপাত্র শিশুটী নানা সমুদ্রে ভাসিতে

ভাসিতে বিভিন্ন নদীর মধ্য দিয়া রাজা জনকের রাজ্যে উপনীত হইল। কৃষকগণ ভূমিকর্ষণকালে সেই শিশুটীকে পাইয়া রাজাকে দিলেন। রাজা শিশুটীকে স্বীয় কন্যারূপে প্রতিপালন করিলেন। এইরূপে সীতা ব্রাহ্মণ-রক্তে জাত হইয়া পরে রাবণের রাজ্য, প্রাণ ও সর্বস্ব বিনাশ করাইলেন।—আসল জানকী রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন নাই। রাবণ মায়াসীতা অপহরণ করিয়াছিলেন। অপহরণের পূর্বেই আসল জানকী প্রাণত্যাগ করেন।"

"এই আখ্যায়িকাটি আর এক আকারে দেখা যায়। পূর্ববৎ দূতগণ মুনিবৃন্দকে পরামর্শ দিলেন, আপনারা কিছু দিন; নচেৎ রাবণ ছাড়িবেন না এবং আপনাদিগকে কষ্ট দিবেন। সেজন্য মুনিগণ স্ব স্ব উরুদেশ কাটিয়া করস্বরূপ একটী পাত্রে রক্তদান করিলেন এবং বলিলেন, "এই পাত্রে যে রক্ত আছে তাহা যথায় রাখা হইবে তথায় সর্বনাশ ও ধ্বংস উপস্থিত হইবে।" ঋষিগণের এই অভিশাপ শুনিয়া রাবণ রক্ত-পাত্রটি রাজা জনকের রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন যাহাতে তথায় ধ্বংসলীলা উপস্থিত হয়। পাত্রটি তথায় আনীত ও জনকের ক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। তখন এইরূপ ঘটিল যে, জনকের রাজ্যে ভীষণ অনাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, বারিবর্ষণ আদৌ হইল না এবং তাহার ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজাকে পরামর্শ দিলেন, যদি রাজা এবং তাঁহার রাণী স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ করেন তাহা হইলে বৃষ্টিপাত হইবে। তদনুসারে রাজা এবং রাণী তদ্রূপ করিলেন। রাজা লাঙ্গল ধরিলেন এবং রাণী রাজার হাত ধরিয়া রহিলেন। হলের অগ্রভাগ দৈবাৎ রক্ত-পাত্রটিকে আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ পাত্র হইতে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি নাম্নী চৌরিব্যজনরতা নারীযুগল সহ সীতাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। নারীযুগল পরে তিরোহিত হইলেন এবং সীতাদেবী বালিকারূপে দেখা দিলেন। রাজা জনক স্বীয় কন্যার ন্যায় তাঁহাকে লালনপালন করিলেন। সীতাদেবী প্রত্যহ বাম হস্তে শিবের ধনুক তুলিয়া রাজার কক্ষে রাখিয়া

তাঁহা পূজা করিতেন এবং তদন্তে ধনুর স্থানটি পরিষ্কার করিতেন। ইহা দেখিয়া রাজা জনক এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, যিনি শিবের ধনু ভগ্ন করিবেন তিনিই সীতার সহিত পরিণীত হইবার যোগ্য।"

"গন্ধমাদন পর্বত অনতিক্রম্য অতিমাদক ইন্দ্রিয়-সুখ। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রামের বাসভূমি।"

"শাক্ত দর্শন মতে তত্ত্ব দশটী। এই দর্শনের শাস্ত্রসমূহে তত্ত্বনিচয়ের সংজ্ঞা আছে। জড়া প্রকৃতি যে সকল সূক্ষ্ম ভূতে বিলীনা হন তাহাদিগকে তত্ত্ব বলে। মহাবিন্দু, নাদশক্তি, মিশ্রবিন্দু প্রভৃতিকে তত্ত্ব বলে।"

"নরদেহ একটী ক্ষুদ্র জগৎ—microcosm এবং বিশ্ব একটী বৃহৎ জগৎ—macrocosm। ঈশ্বর কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া উভয় জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই মানবদেহেও দেবগণ ও দানবগণ বাস করেন। দেহের বামার্ধে ঈড়ার দিকে দেবগণের বাসস্থান, দক্ষিণার্ধে পিঙ্গলার দিকে দানবভূমি। এই দেহে সতত দেবাসুর সংগ্রাম চলিতেছে। কখন কখন দেবগণ জয়লাভ করেন, কখন কখন দানবগণ। ঈশ্বর মধ্যস্থ থাকিয়া উভয়ের নিয়ামক।"

"স্বীয় গুরুর প্রতি সর্বান্তরিক ভক্তি এবং জগদম্বার চরণে গভীর প্রেম ও আত্মনিবেদন এবং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিঃস্বার্থ কর্মই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহার ফলে ত্যাগ-বৈরাগ্য লাভ হয়। ইহাতে যাঁহারা একনিষ্ঠ তাঁহাদের নিকট অন্যান্য সাধন যথা সময়ে প্রকাশিত এবং তাঁহাদের সমস্ত কামনা সত্য ও সিদ্ধ হয়।"

দেবীভাগবতের ইংরাজী অনুবাদের তৃতীয় খণ্ডে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই সংক্ষিপ্ত প্রাক্‌বাণী লিখিয়াছেন।—"এই খণ্ডে প্রধানতঃ দেবীর দুর্গা, কালী, ভবানী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবতারের স্তোত্র ও মাহাত্ম্যাদি আছে। দেবীভাগবত শক্তিপূজা প্রচারে নিযুক্তা। সেজন্য ইহা শাক্তদের নিকট অতিশয় আদরণীয়া। শাক্তগণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন তাঁহাদের নিকট এই ইংরাজী অনুবাদ বিশেষ উপকারী ও পাঠযোগ্য হইবে।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ইংরাজী অনুবাদের তৃতীয় খণ্ডে যে সকল সারগর্ভ ও সুচিন্তিত টীকা দিয়াছেন সেগুলির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"রস অর্থে গভীর মনোভাব। সাধারণতঃ রস আট প্রকার। রসশাস্ত্রে আছে—

শৃঙ্গারঃ হাস্যঃ করুণঃ রৌদ্রঃ বীরঃ ভয়ানকঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেতি অষ্টৌ নাট্যান্ রসাঃ স্মৃতাঃ॥

ইহাদের সহিত কখন কখন শান্ত রস যোগ করা হয়। এইরূপে রসের মোট সংখ্যা হয় নয়। কখন কখন দশম রসরূপে বাৎসল্য সংযোজিত হয়।"

"দেবগণ ও দৈত্যগণ একই সৃষ্টির দুই বিপরীত দিক।"

একটি দেশ ও উহার অধিবাসিগণের নাম কাম্বোজ। যে গিলগিট উপত্যকাকে হিন্দুকুশ পর্বত বাল্‌খ হইতে পৃথক্ করিয়াছে, তথায় কাম্বোজগণ বাস করিতেন। সম্ভবত হিন্দুকুশ ছোট তিব্বত এবং লাডাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালকেয়গণ আফ্রিদি হইতে পারেন।"

"নবাক্ষর মন্ত্রটি এই—ওঁ মহিষমর্দিন্যৈঃ স্বাহা। উক্ত মন্ত্রে ওঁ এর পরিবর্তে হ্রীং ক্লীং ঐং শ্রীং বা হূং ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সকল বীজমন্ত্র সারদাতিলক, নারায়ণীতন্ত্র, কিংবা বিশ্বসার তন্ত্রে পাওয়া যায়।"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং সদাশিব যথাক্রমে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।"

"১০৮ সংখ্যাটি অতি শুভ ও সৎ। মাতৃগর্ভে শিশু ২১৬০০০ সংখ্যক নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, প্রত্যেক নিশ্বাসে সে ঈশ্বরের নাম লইবে। উপরোক্ত প্রথম তিনটী সংখ্যার অর্ধেক ১০৮। ∴ অন্ততঃ এত বার নাম রোজ প্রত্যেকের লওয়া উচিত। একদিনে ১৬৪০০০ সেকেণ্ড আছে। ইহার অষ্টমাংশ ১০৮ হইতে পারে, যদি দুটি শূন্য বাদ দেওয়া হয়। এইরূপে যিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন তিনিও এই সংখ্যার দ্বারা সূচিত হন।"

"ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন ও ধ্যান শ্রেষ্ঠ উপাসনারূপে কথিত। ব্রহ্মোপাসনার ইহাই পদ্ধতি। কোথাও কোথাও জ্ঞান শব্দের দ্বারা ব্রহ্মা সূচিত। কারণ ব্রহ্মা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সকল প্রাণী অপেক্ষা ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট। ভাগবত পুরাণে ব্রহ্মার বাক্যে, ব্রহ্মা শব্দে বিজ্ঞান সূচিত। তথায় ব্রহ্মা বলেন, কারণ-সলিলে শায়িতা শক্তিরূপিণী দেবীর নাভিকমল হইতে বিজ্ঞানশক্তিরূপী আমি উদ্ভূত। বিষ্ণুকে প্রাণ বলা হয়। কারণ তিনি প্রাণনেতা। বিষ্ণুর আর একটি নাম বাক্। কারণ তিনি সকলের গুরু। বিষ্ণুকে মানস বলে। কারণ তিনি মন্ত্রী, তিনি সর্বজীবের নিয়ন্তা। ব্রহ্মের মননান্তে ব্রহ্ম ধ্যান করিতে হয়।"

"ব্রহ্ম অন্তর্যামী পুরুষ। তিনি হৃদয়ে বাস করেন। এই হৃদয়ে ৭২০০০ নাড়ী সংহত আছে, 'অরা ইব রথনাভৌ'। তিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিচরণ করেন স্বীয় সুখের জন্য নহে; পরন্তু ইন্দ্রিয়বর্গকে সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করিবার জন্য। সর্বগুণযুক্ত প্রণব সর্বদা জপ ও ধ্যান করা উচিত। ইনি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় বিশ্ব ও তৈজসরূপে প্রকাশিত হন। ইনিই সুষুপ্তি অবস্থায় অদ্বৈত প্রাজ্ঞরূপে বিরাজ করেন। তিনি তমসাতীত এবং মর্ত্যদেহ রহিত। মন্ত্ররূপী প্রণবকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে ব্রহ্মানুভূতি হয়। এই প্রকার ধ্যানের ফলে পরম কল্যাণ লাভ হয়, সকল অমঙ্গল তিরোহিত হয় এবং স্বহৃদয়ে আত্মবিকাশ বা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"বিষ্ণুকে পরাবর বলে। কারণ পরা শব্দের অর্থ রামাদি উচ্চশ্রেণীর জীব এবং ব্রাহ্মণাদি নিম্নশ্রেণীর জীব, অবর তাঁহারই প্রকাশ।"

"অবিদ্যা ঈশ্বর ও জীব উভয়কেই আবৃত করে। ইহার প্রভাবে জীব কর্তৃক ঈশ্বর দৃষ্ট হন না এবং জীব ঈশ্বর দর্শন করিতে পারে না। কিন্তু অবিদ্যাসৃষ্ট বন্ধন জীবের পক্ষে প্রাকৃত, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে মায়িক। ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি অবিদ্যা নামে অভিহিতা। প্রকৃতির বৈষম্য অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকাশিত হয়। অবিদ্যানাশের অর্থ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি। অবিদ্যার বিনাশ এবং ইহার উন্মোচন এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

আছে। অবিদ্যার উন্মোচনে উহার লেশটুকু অবশিষ্ট থাকে। কারণ ইহাতে পরোক্ষ জ্ঞান, সত্যের বুদ্ধিগত অনুভব হয়। কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানে যে ব্রহ্মানুভূতি হয় তদ্দ্বারা অবিদ্যার আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে। পাঁচ প্রকার বন্ধন আছে। নিম্নতম বন্ধনের নাম অবিদ্যাবন্ধন, তৎপরে লিঙ্গদেহবন্ধন, তৎপরে প্রমাচ্ছাদিকা প্রকৃতিবন্ধন, তৎপরে কামবন্ধন এবং শেষে কর্মবন্ধন। যখন এই পঞ্চ প্রকার বন্ধন বিনষ্ট হয় তখন জ্ঞানী জ্যোতিঃমার্গে সান্তাঙ্ক লোকে গমন করেন। আরো অগ্রসর হইবার পূর্বে শিশুমারকে সকলে নমস্কার করেন। শিশুমার বিশ্বের দ্বারপথে বিরাজমান। শিশুমার শব্দের আক্ষরিক অর্থ শিশুর মারক বা নাশক। উত্তরাকাশে ধ্রুবতারার পার্শ্বে শিশুমার নামে নক্ষত্রমণ্ডল আছে। ইংরাজিতে উহা সম্ভবতঃ ড্রাকো বা আরসা মাইনর নামে অভিহিত। ভাগবত পুরাণের ৫ম স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে ইহা উচ্চকোটী জীবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। এই বিশ্বের পারগামী প্রত্যেক জ্ঞানী দ্বারপাল শিশুমারকে অতিক্রম করেন। থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর 'সিক্রেট ডক্‌ট্রিন' (গুপ্তরহস্য) নামক গ্রন্থে ইহাকে 'রিং পাশ নট' (Ring passknot) বলে। একটি শ্লোকে শিশুমার শব্দ শ্রীহরির অন্যতম নামরূপে ব্যবহৃত। উক্ত শ্লোকে আছে, পরমপুরুষ শ্রীহরি অসংখ্য জগতের আশ্রয় এবং শিশুমার নামে কথিত। পরমেশ্বর লাভের পথে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে প্রণাম করেন। ডলফিনাস নামক ইংরাজি নক্ষত্রমণ্ডলও শিশুমার নামে অভিহিত। ধ্রুবতারাকে কখন কখন শিশুমার বলা হয়।"

"বিশ্বসূর্য শিশুমাররূপে শ্রীহরি বিশ্বদ্বারে অবস্থিত। এমন কি, তিনি আমাদের সূর্যের কেন্দ্রস্থলেও বিরাজমান হইয়া সকল গ্রহকে আলোকিত করেন। পরব্রহ্মকে প্রথমে শিশুমাররূপে ধ্যান করিতে হয়, পরে গায়ত্রীরূপে।"

"মানুষের হৃদয়-পুরীতে ব্রহ্ম প্রকটিশত হন। এজন্য হৃদয়ের একটি নাম ব্রহ্মপুরী। বিশ্বে তিনি হিরন্ময়কোষ সবিতারূপে প্রকটিত। এই দুই স্থানে ব্রহ্মধ্যান করিতে হয়। হিরন্ময়কোষে এবং হৃদয়ে ব্রহ্মধ্যান সর্বশাস্ত্রবিহিত। পাছে কেহ ভুল করিয়া বসেন ব্রহ্ম এই দুই স্থানে সীমান্বিত, সেজন্য ভাবিতে হইবে যে, এই দুই স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমাদের ধ্যানার্থ নির্বাচিত। তুরীয় জগতের প্রধান নিয়ন্তা অনন্তদেব পরব্রহ্ম।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ দেবীভাগবতের যে সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন উহার তৃতীয় খণ্ডে বিস্তৃত ভূমিকা দিয়াছেন। সমগ্র ভূমিকাটীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে একটীমাত্র পুরাণ রচনা করেন। ইহা হইতে তৎশিষ্য লোমহর্ষণ এবং অন্য দুই জন শিষ্য আরো তিনটী সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই চারি পুরাণ হইতে অষ্টাদশ মহাপুরাণ উৎপন্ন। ইহার দীর্ঘকাল পরে অন্যান্য উপপুরাণের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক পুরাণ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে সহজে প্রতীত হয়, আদি পুরাণ সংহিতা হইতে অন্যান্য সকল পুরাণ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত। ইহার স্বপক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম এবং অন্যান্য পুরাণে সৃষ্টিক্রম পাঠে দেখা যায়, সকল পুরাণে একই বিষয় আলোচিত। উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এত সন্নিকট যে, অনেক স্থলে শ্লোকসমূহও অভিন্ন। কোন কোন পুরাণে কতকগুলি শ্লোক অধিক সদৃশ এবং কতকগুলি পুরাণে অল্প সদৃশ। কিন্তু সকল পুরাণের আদর্শ একই। সেই জন্যই সকল পুরাণের শ্লোক ও বর্ণনায় সাদৃশ্য এত জাজ্জ্বল্যমান। যদি পূর্বে বিভিন্ন মৌলিক পুরাণ থাকিত এবং বর্তমান পুরাণগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে রচিত হইত তাহা হইলে এত সন্নিকট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইত না।

"বিষ্ণুপুরাণে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ পুরাণের নাম যথাক্রমে উল্লিখিত

আছে। প্রথম ব্রহ্ম, দ্বিতীয় পদ্ম, তৃতীয় বিষ্ণু, চতুর্থ শৈব, পঞ্চম ভাগবত, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম মার্কণ্ডেয়, অষ্টম আগ্নেয়, নবম ভবিষ্য, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত, একাদশ লিঙ্গ, দ্বাদশ বরাহ, ত্রয়োদশ স্কন্দ, চতুর্দশ বামন, পঞ্চদশ কূর্ম, ষোড়শ মৎস্য, সপ্তদশ গরুড় এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এই সকল পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত—এই পাঁচটি বিষয় বর্ণিত। "হে মৈত্রেয়! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুপুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহা পদ্মপুরাণ অনুসারে রচিত।"—বিষ্ণু পুরাণের এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ পুরাণ একই সময়ে রচিত বা সঙ্কলিত হয় নাই। প্রথমে ব্রহ্মপুরাণ লিখিত হয়, পরে পদ্মপুরাণ, তৎপরে বিষ্ণুপুরাণাদি। ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ একটির পর একটি রচিত, লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

"ডাঃ এইচ এইচ উইলসনের মতে নবম শতক হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে কতিপয় পুরাণ রচিত হয়। পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত এবং প্রাচ্যের বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ ডাঃ উইলসনের সঙ্গে এবিষয়ে একমত। উপরোক্ত পণ্ডিতগণ ঘোষণা করেন যে, স্কন্দপুরাণ অতি আধুনিক। কিন্তু ভারতের অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই মত গ্রহণ বা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে স্কন্দপুরাণের নন্দীকেশ্বর-মাহাত্ম্যের যে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতঃ সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কন্দ-পুরাণের কাশীখণ্ডের যে পুঁথি আছে তাহা ৯৩৩ শকাব্দে হস্তলিখিত। এই সকল কারণে বর্তমানে প্রচলিত মূল স্কন্দপুরাণ এত আধুনিক বিবেচিত হইতে পারে না। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেও স্কন্দপুরাণ প্রচলিত ছিল। ইহা সন্দেহাতীত। এতদ্ব্যতীত মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে শংকরাচার্য্যের উদ্ধৃতি সমূহ, সপ্তম শতাব্দীতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হইতে বাণভট্ট কর্তৃক উপাদান সংগ্রহ ও পবনপ্রোক্ত পুরাণের উল্লেখ এবং তাঁহার

সমসাময়িক ময়ূরভট্ট কর্তৃক সৌর পুরাণ হইতে সূর্য্যশতকের উপকরণ সংগ্রহ, তৎকালে মূল উৎস বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ হইতে ব্রহ্মসিদ্ধান্তের সংকলন, একাদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজা বল্লাল সেন প্রদত্ত আদিত্য, বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু ও বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণসমূহ হইতে আলবারুণি কর্তৃক প্রমাণসংগ্রহ এবং তদুল্লিখিত ব্রহ্ম, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, বরাহ, সূর্য ও বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণসমূহ এবং আদ্য কালিকা নন্দী নরসিংহ প্রভৃতি উপপুরাণসমূহ হইতে আমরা নিশ্চিত ভাবে ডাঃ উইলসন ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির অভিমত অস্বীকার করিতে পারি।"

"শঙ্করাচার্য্য, বাণভট্ট প্রভৃতির পূর্বেও অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত ছিল। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি বিভিন্ন ব্যক্তি ও বংশাদি সম্বন্ধে ঘটনার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইবে যে, আদি প্রথম নয়টী পুরাণ আপস্তম্ব ধর্মসূত্র লিখিত হইবার পূর্বে রচিত ও লিপিবদ্ধ। এইরূপে প্রধান পুরাণগুলির রচনাকাল বৈদিক যুগের ঠিক পরেই পড়ে। অষ্টাদশ পুরাণের যে আধুনিক আকার প্রচলিত দেখা যায়, তাহা পূর্ব কালে ছিল না। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আদি বিষ্ণুপুরাণ পরীক্ষিতের সময়ে, গরুড় পুরাণ পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের সময়ে এবং মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ জনমেজয়ের পৌত্র অধিসীম কৃষ্ণের সময়ে রচিত হয়। ভবিষ্য রাজবংশের বর্ণনা এই পুরাণগুলিতে পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে ভবিষ্য রাজবংশের বর্ণনা একটী প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে হয় না। বংশানুচরিতের অর্থ প্রসিদ্ধ রাজাগণ এবং তাঁহাদের জাত ও মৃত বংশধরগণের বর্ণনা, ভবিষ্য রাজবংশের বর্ণনা নহে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বিষ্ণু, মৎস্য বা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এইজন্য বংশানুচরিত তত স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহার অর্থ পরবর্তী ভাগবত পুরাণে ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান রাজবংশের বর্ণনা বলিয়া গৃহীত এবং তদ্রূপ লিখিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে

অতীত ও বর্তমানের বিষয় লেখা এক কথা, আর ভবিষ্যতের সম্বন্ধে লেখা অন্য কথা। যদিও পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের যবদ্বীপ সংস্করণে ভবিষ্য রাজবংশের কোন উল্লেখ নাই, তথাপি সেই সময় হইতে এই সকল বিষয় বিভিন্ন পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ কুমারিল্ল ভট্টের তন্ত্রবার্তিক দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। ভট্ট কুমারিল্ল এক স্থানে লিখিয়াছেন, "পুরাণসমূহের আলোচ্য বিষয় ভূ-বিভাগ, বংশানুক্রম, দেশ-সকলের পরিমাণ ও তাহাদের অস্তিত্বকাল, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রভৃতি।"

"বিশুদ্ধ স্বর্ণ খাদমিশ্রিত হইলে যেমন হয় বিভিন্ন পুরাণগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক সংকলিত হওয়ায় তেমনি হইয়াছে। মিশ্রিত দ্রব্য হইতে দহনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ স্বর্ণ পৃথক্ করা এখন কঠিন ব্যাপার। অষ্টাদশ পুরাণ প্রথমে বিশুদ্ধ আকারে কিরূপ ছিল তাহা মৎস্য পুরাণ দেখিয়া ধারণা করা যায়। বিখ্যাত পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়াছেন, "পুরাণসমূহের আলোচ্য বিষয় সৃষ্টি ও উপসৃষ্টি, বংশাবলী ও বিখ্যাত বংশধরগণের জীবনী বর্ণনাদি। ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মোৎসবাদি বিষয়ে পরামর্শদান তাহাদের উদ্দেশ্য নহে।" কিন্তু অধুনা যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচলিত আছে উহাদের অধিকাংশ দেবদেবীগণের মাহাত্ম্যকীর্তন এবং তাঁহাদের পূজা উৎসব ব্রতনিয়মাদি বর্ণনায় পরিপূর্ণ। পূর্ববর্ণিত পঞ্চ লক্ষণ যেন এখানে পরিশিষ্টমাত্র। বর্তমান পুরাণসমূহের ন্যায় যদি প্রাচীনতর পুরাণগুলির উদ্দেশ্য ধর্মোপদেশ দান হইত তাহা হইলে উহা সূত-বর্ণীয়গণ দ্বারা কথিত হইত না। ইহা নিশ্চয়ই ষট্‌কর্মশালী ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য হইত। ঋষি, মুনি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণেরও উপদেশ দান সূতবর্ণীয়গণের কর্তব্য হইত না।

"এই পুরাণগুলি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদের প্রাধান্য প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ। অবতারবাদ প্রচার ইহাদের একটী প্রধান কার্য্য। শিবমাহাত্ম্য কীর্তনরত পুরাণগুলিতে বহু শিবাবতার বর্ণিত। সেইরূপ বৈষ্ণব পুরাণসমূহে বিষ্ণুর বহু অবতারের কথা লিখিত। দশাবতার হইতে

অনেকে মনে করেন, পুনর্জন্মবাদ অতি আধুনিক কালের; কিন্তু তাহা সত্য নহে। ইহা পুরাকালে বেদসমূহের প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যেও পাওয়া যায়; শতপথ ব্রাহ্মণে (১-৮-১-২।১০) মৎস্যাবতার, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১-২৩-১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (৭-৪-৩-৫) কূর্মাবতার, ঋক্ সংহিতার (১-১২-১৭) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১-২-৫-১।৭) বামনাবতার, ঐতরেয় পুরাণে রাম ভার্গবাবতার, ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩-১৭) দেবকীনন্দন কৃষ্ণাবতার, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০-১-৬) বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত। বৈদিক গ্রন্থাবলীর অধিকাংশমতে কূর্মবরাহাদি ব্রহ্মার অবতার। কিন্তু বৈষ্ণব পুরাণসমূহে ইহাদিগকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে।

"সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ও অন্যান্য শৈব পুরাণে শিবের ভিন্ন ভিন্ন অবতার স্বীকৃত। ভবিষ্য ও সৌর পুরাণাদিতে সূর্য্যের অবতারসমূহও উল্লিখিত আছে। একদিকে যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও সূর্য্যের উপাসকগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে নিরত সেইরূপ অন্যদিকে ঋষি মার্কণ্ডেয় এবং অন্যান্য মুনিগণ শাক্ত পুরাণসমূহে দেবী ভগবতীর লীলাগানে প্রমত্ত। বেদসমূহের নানা স্থানে ব্রহ্মা প্রাচীনতম উপাস্য দেবতারূপে উল্লিখিত। সেই কারণে ইহা মনে করা উচিত নয় যে, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতার পূজা অতি আধুনিক। ঋক্ সংহিতার বহু স্থানে শত শত বিষ্ণুমন্ত্র দৃষ্ট হয়। সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদেও তদ্রূপ। ঋক্ সংহিতায় মহাদেব রুদ্রনামে অভিহিত। চতুর্বেদে রুদ্রদেবের সূক্ত গীত হয়। যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায় তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম। যদিও আধুনিক পণ্ডিতগণ বৈদিক রুদ্র এবং মহাদেবের অভিন্নতা স্বীকারে অনিচ্ছুক তথাপি আমরা উপরোক্ত ঐক্য স্বীকৃতিতে ইতস্ততঃ করি না। কারণ আমরা বাজসনেয় শতরুদ্রীতে শিব, গিরীশ, পশুপতি, সিতিকণ্ঠ, ভব, শর্ব, মহাদেব প্রভৃতি নাম দেখিতে পাই। বিশেষতঃ উক্ত বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার আর একটী প্রমাণ এই যে, অথর্ব সংহিতায় মহাদেব (৯-৭-৭), ভব (৬-৯৩-১), পশুপতি (৯-২-৫)

প্রভৃতি নাম দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (৬-১-৩-৭।১৯) এবং সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে আমরা যখন শিবোৎপত্তি পাঠ করি তখন উপরোক্ত বিষয় এবং মার্কণ্ডেয় ও বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত তথ্যের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখি না। সেইরূপ সূর্য্যোপাসনাও বেদে অতি প্রাচীন।

"এখন আমরা বেদে শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শিবদুর্গার নাম শুনিয়াই কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অতি আধুনিক কালের বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু দুর্গা বা শক্তির উপাসনা প্রকৃত পক্ষে এত আধুনিক নহে। যখন আমরা বাজসনেয় সংহিতায় (৩-৫৭) অম্বিকা ও শিব (১৬-১), তলবকার উপনিষদে (৩-১১-১২ এবং ৪-১-২) ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী উমা হৈমবতী, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০ম প্রকরণে) কন্যাকুমারী, কাত্যায়নী, দুর্গা ইত্যাদি পাঠ করি তখন আমরা শিবসঙ্গিনী দুর্গাকেই মনে করি। অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তির উপাসনা ভারতে প্রচলিত। বেদপাঠে ইহা উত্তমরূপে হৃদ্গত হয়। বৈদিক গ্রন্থসমূহে যাহা বীজাকারে উদ্গত তাহাই পুরাণসমূহে পল্লবিত ও পুষ্পিত। গল্পের মত বিস্তৃত বর্ণনা দেখিয়া আমরা মনে করি, পুরাণসমূহ আধুনিক। পূর্বপক্ষিগণের যে বিশ্বাস বেদসমূহে ধ্বনিত বা বিম্বিত সেই বিষয়ই পুরাণসমূহে বিকৃত ও বিস্তৃত ভাবে বৃহদাকারে বিবৃত। ঋক্ সংহিতার 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে অদম্ সমুধমস্য পংশুরে' এবং 'ত্রীণি পদ বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপ অদভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধরয়ান' (১-২২-১৭।১৮) এই ঋক্দ্বয় আলোচনা করুন। ইহার অর্থ—'বিষ্ণু ইহলোকে ত্রিপদ ক্ষেপ করিলেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁহার পদরজে পরিব্যাপ্ত।' পৌরাণিকগণ ইহাকে বামনের বলিজয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইত্যাদি। বেদসমূহে যাহা সুদূর অভিপ্রায়ে বিবৃত তাহাই পুরাণসমূহে সুবৃহৎ উপাখ্যানের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। সেইজন্য পুরাণে আমরা এত বিকৃতি ও বিভেদ দেখিতে পাই। ইহার ফলে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার ও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ধারণ করিয়াছে।

কেবলমাত্র এই কারণে আমরা পৌরাণিক বর্ণনাগুলিকে অত্যদ্ভুত, অতিরঞ্জিত, আধুনিক ও অর্থহীন রচনারূপে ফেলিয়া দিতে পারি না।

"সুপ্রাচীন কাল হইতে এদেশে বিভিন্ন উপাসক সৃষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণের দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ধর্মসম্প্রদায়গুলি উৎপন্ন। জাতির ধর্মীয় বা নৈতিক ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। যে ঋষি কোন বিশেষ দেবতাকে উপাসনার দ্বারা কাম্য বস্তু লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক যে, সেই দেবতাকে তিনি ভক্তি করিবেন এবং প্রাণমন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিবেন এবং আন্তরিক আশা করিবেন, অন্যেও তাঁহার ইষ্টদেবতাকে এই প্রকার গভীর প্রীতিভক্তি অর্পণ দ্বারা স্ব স্ব কাম্যবস্তু ও পরমানন্দ লাভ করুন। অপরকে স্বানুভূত আনন্দ-মাধুর্য্যের আস্বাদ দিবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন মুনিঋষি এবং সম্প্রদায় কর্তৃক নানা দেবতা উপাসিত। এই সকল দেবভক্ত ঋষিগণের শিষ্যমণ্ডলী হইতে বহু বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় জগতে আবির্ভূত হইয়াছে।

"বেদ সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে। ঋত্বিক, হোতা, উদ্‌গাতাদি বিভিন্ন যাজ্ঞিকগণ বেদকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন। ইতিহাস ও পুরাণসমূহ তদ্রূপ নহে। সেইগুলি সকল নরনারীর সাধারণ সম্পদ্। জনসাধারণকে নানা ধার্মিক নৈতিক সামাজিক শিল্পকলাদি বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য পুরাণসমূহ প্রণীত। এইজন্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গ চতুর্বেদ ও উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি যদি পুরাণজ্ঞ না হন তিনি কখনও স্পষ্টদৃষ্টি, প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ হইতে পারেন না। কারণ ইতিহাস-পুরাণাদিতে বেদই বিশদভাবে বিবৃত, সম্বর্ধিত ও ব্যাখ্যাত। যাঁহারা পুরাণজ্ঞানহীন তাঁহারা বেদভীরু এবং তাঁহারাই বেদের অবমাননা করেন। পুরাণসমূহ সুপ্রাচীন ও বেদের টীকাস্বরূপ বলিয়া পুরাণ নামে অভিহিত। যাঁহারা পুরাণজ্ঞ তাঁহারা সর্বপাপমুক্ত।

"ইতিহাস ও অন্যান্য পুরাণ রচিত ও লিখিত হইবার পরে বিষ্ণু ভাগবত

লিখিত হয়। ইহাতে শ্রীব্যাসদেব পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন। এইজন্য ভাগবতের একটি নাম পঞ্চমেতর পুরাণ। কাহারো কাহারো অভিমত এই যে, বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণিক বোপদেব কর্তৃক ভাগবত বিরচিত। স্বর্গ, বিসর্গ, সংস্থা, রক্ষা, মন্বন্তর, বংশকথন, বংশানুচরিত, প্রলয়, হেতু এবং অপাশ্রয়—পুরাণের এই দশটী লক্ষণ। অন্যান্য কাহারো কাহারো মতে আলোচ্য পঞ্চাঙ্গ যে সকল লক্ষণে লক্ষিত সেগুলি মহাপুরাণ। আর যেগুলি পঞ্চলক্ষণান্বিত সেগুলি উপপুরাণ বা অল্পপুরাণ। মহৎ, অহঙ্কার, স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় এবং জড় সৃষ্টির নাম সর্গ। মনোগত বীজ বা বাসনা হইতে চরাচর বস্তুর সৃষ্টিকে বিসর্গ বলে। চর ভূত ও মানবগণের জীবনযাত্রা প্রণালীকে সংস্থা বা স্থিতি বলা হয়। দেব তির্য্যগ মানব ও ঋষিগণের রক্ষার্থ নারায়ণের নররূপে অবতরণই রক্ষা। অংশাবতারের কালই মন্বন্তর নামে কথিত। ব্রহ্মার বংশে জাত কতিপয় সাধু রাজার ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্ত্তমান ইতিবৃত্তের বর্ণনার নাম বংশকথন। তাঁহাদের বংশধরগণের চরিত্র বর্ণনা বংশানুকথন নামে অভিহিত। নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক নিত্য আত্যন্তিক—এই চার প্রকার লয়কে প্রলয় বলে। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের কারণরূপে জীবকে বর্ণনা করার নাম হেতু। অপাশ্রয়কে পরমাশ্রয় বা পরম সান্ত্বনা বা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের পরম সাক্ষী বলা যায়। উপপুরাণের পাঁচটী লক্ষণ সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত। এই পঞ্চ লক্ষণ বিবেচনা করিলে মনে হয়, দেবীভাগবত একটি মহাপুরাণ। দেবীভাগবতে তিন শত আঠার (৩১৮) অধ্যায় আছে, কিন্তু বিষ্ণুভাগবতে তিনশত বত্রিশ (৩৩২) অধ্যায়। সুতরাং অধ্যায় সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ষড় দর্শনানুসারে লিখিত বলিয়া শ্রীবিষ্ণুভাগবত প্রধানতঃ দার্শনিক গ্রন্থ; অন্য পক্ষে শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত তন্ত্রানুবর্তী। সেইজন্য দেবীযামল সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে দেবীভাগবতের প্রাধান্য স্বীকৃত। সুতরাং কোন কারণেই

দেবীভাগবত আধুনিক বিবেচিত হইতে পারে না। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রথম শতকে তন্ত্রগ্রন্থ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইহাতে রাধার কোনও উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে যদিও শ্রীদেবীভাগবতের কতক অংশ বিষ্ণুভাগবত অপেক্ষা প্রাচীনতর, তথাপি ইহার বর্তমান আকার নবম এবং একাদশ শতাব্দীর মধ্যে সৃষ্ট। নীলকণ্ঠ এবং শ্রীধর স্বামী এই দেবীভাগবতের দুই টীকাকার।

"উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে একটিমাত্র ভাগবত ছিল এবং তাহা ভাগবতগণ কর্তৃক সমাদৃত হইত। তৎপরে বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ক্ষীয়মাণ হইল তখন প্রাচীন ভাগবত মৃতপ্রায়। পরে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিল তখন বৈষ্ণব ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সেই সময়ে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভাগবত এবং শাক্তগণ দেবীভাগবত সঙ্কলন করিলেন। উপসংহারে আমরা মুক্ত কণ্ঠে ইহা বলি যে, মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী ও মনসাদি দেবীর উপাখ্যান দেবীভাগবতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমরা ইহাকে প্রাচীন পুরাণের শ্রেণীভুক্ত করিতে ইতস্ততঃ করি এবং আমরা এরূপ ভাবিতে বাধ্য হই যে, বাংলা সাহিত্য হইতে অনেক আধুনিক অংশ ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

সুদীর্ঘ ভূমিকার অনুবাদ এখানে সমাপ্ত হইল। এবারে আমরা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মন্তব্যগুলির অনুবাদ পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

"দুর্গা মূলা প্রকৃতির অবতার, লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মত রাধার অবতার নহে। দুর্গা নারায়ণী, ঈশানী, ঈশ্বরী।"

"শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত সনাতন পুরুষ। তিনি প্রকৃতির স্রষ্টা। তাঁহার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি রচিত। তিনি সকল শক্তির অধীশ্বর। এই সকল শক্তি তাঁহা হইতে নির্গত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল শক্তির

সহিত লীলা করেন। এই সকল শক্তি অতিশয় প্রভাবশালী ও ভয়ঙ্কর। কারণ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় তাঁহাদের দ্বারা সংসাধিত হয়। এই সকল শক্তির উদ্ভব, প্রবাহ ও বিলয় নামক তিনটি গুণ আছে। অবশেষে তাঁহারা মূল উৎসে ফিরিয়া যান। এইরূপে এক কল্প হয়। কল্পকে জীবন-মুহূর্ত বা কাল বলা চলে। এই সকল শক্তি হইতে ত্রিগুণ উদ্ভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহাশক্তির অনন্ত কেন্দ্র। তিনি শক্তিমান্, সুন্দর ও ভীষণ। জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে তুরীয়ের পরিণতির মধ্যবর্তী কালে এই সকল ঘটনা ঘটে। তুরীয় অবস্থা হঠাৎ অবস্থাত্রয়ে পরিবর্তিত হয় না, পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়া থাকে। আমাদের স্বপ্ন ও দর্শনাদির কারণ ইহাই। বিশুদ্ধ মনে স্বপ্ন ও দর্শনাদি হইলে সত্য হয়।"

"যে কোনও জীব মুক্তিপথে চলিতে চলিতে যমত্ব অতিক্রমের আশা করিতে পারে। সে ইচ্ছা করিলে কিছু কাল যমও হইতে পারে।"

"যে গুরু কোনও প্রণামী না পাইয়া ঈশ্বরের নাম যোগ্য বক্তিকে দীক্ষা দিতে সমর্থ তিনিই প্রকৃত গুরু।"

"কাব্যবাহোঽনলঃ সোমোযমশ্চৈবার্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ বর্হিষদা সোমোপা পিতৃদেবতা॥

অন্য পুরাণমতে এই সাতজন পিতৃঃ আছেন। ইঁহাদের চারজনের আকার আছে এবং অন্য তিনটী তেজোময়।"

""গুরুদত্ত মন্ত্র শুধু বীজমাত্র নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা হইতে যে কম্পন উত্থিত হয় তাহাই বীজমন্ত্ররূপে পরিণত। বীজমন্ত্রে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি পূর্ণরূপে নিহিত। ইহা জপ করিলে অলৌকিক দর্শন, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, এবং অসীম শক্তির বিকাশ ও সিদ্ধিলাভাদি হয়। অন্য উপায়ে এই সকল দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায় না। উহাদের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিতে বিরাট বিশ্ব বিকম্পিত হয়। সুষুম্না নাড়ীতে যে ছয়টি শক্তি-কেন্দ্র বা চক্র আছে সেগুলিই মন্ত্রের আধার। এই ষট্চক্রের মধ্যে মন্ত্ররূপে শক্তির

পরিণাম ঘটে। ষট্‌চক্রে কতকগুলি মন্ত্র অন্তর্হিত এবং কতকগুলি আবির্ভূত হয়।”

মালার ১০৮ সংখ্যা দ্বারা ১০৮ বেদ সূচিত। বেদই ব্রহ্ম এবং সর্ব জ্ঞান ও সর্বানন্দের আকর। অথর্ববেদের সব শাখাতে শিরোব্রতকে পাশুপত ব্রত বা শিবরাত্র বলা হইয়াছে। শিরোব্রত নিত্য অভ্যাস করিতে হয়। অথর্ববেদের ছয়টী মন্ত্র উচ্চারণান্তে সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপনকেই শিরোব্রত বলে। ব্রহ্মবিদ্যালাভের পূর্ব পর্যন্ত সান্ধ্যোপাসনাকালে শিরোব্রত ধারণ করিতে হয়। তৎকরণে অক্ষম হইলে এক বৎসর বা তিন মাস বা বারদিন ইহা করিতে হয়।”

“ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যসি।
ন হি পদ্যসে নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে
সা বদো মা প্রাপৎ॥

অর্থাৎ হে গায়ত্রী, তুমি ত্রিলোকীরূপে একপদী, ত্রয়ীবিদ্যারূপে দ্বিপদী, সর্বপ্রাণরূপে ত্রিপদী, এবং পরম পুরুষরূপে চতুষ্পদী। তুমি পদহীন, কারণ তুমি দুষ্প্রাপ্য। ত্রিলোকের (রজোর) উর্দ্ধে তোমার সুন্দর চতুর্থ পদকে আমি প্রণাম করি। ইহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

“যমের মতে পনের দিন যাবৎ মহাসান্তপণ ব্রত পালন করিতে হয়। প্রথম তিনদিন গোমূত্র পান, দ্বিতীয় তিনদিন গোময়ভক্ষণ, পরের তিনদিন দধিভক্ষণ, তারপর তিনদিন দুগ্ধপান এবং শেষ তিনদিন দধি ও ঘৃতসেবন করিতে হয়। মহাসান্তপণব্রত উদ্‌যাপন করিলে লোকে সর্বপাপমুক্ত হয়।”

———

আট

স্বামী তুরীয়ানন্দের সিদ্ধান্ত*

আমেরিকা-প্রবাসী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বদেশে আসিয়া কাশীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দের পুণ্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ ইংরাজি পুস্তক The Face of Silence এ [১] স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত স্মৃতিকথার আবশ্যকীয় অংশ বাংলায় এখানে উদ্ধৃত হইল।

"স্থানীয় আশ্রমে এবং সহরে স্বামী তুরীয়ানন্দকে কেশরী বলা হইত। তাঁহার করুণাপূর্ণ মুখটি সিংহের ন্যায় দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল; মুখে এতটুকুও অতিরিক্ত অংশ বা একটিও দুশ্চিন্তার রেখা ছিল না। ঘরে বাহিরে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া শ্রদ্ধা পাইতেন। একদিন অন্য একটি যুবকের সঙ্গে আমি তাঁহার সঙ্গে কাশী সেবাশ্রমে বেড়াইতেছিলাম। তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী ছিলেন এবং আমরা তাঁহার দশ বার হাত পশ্চাতে ছিলাম। কয়েক মিনিটের

---

* স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত।

১ ইহার সমগ্র পঞ্চদশ অধ্যায়ে এবং নবম অধ্যায়ের একাংশে স্বামী তুরীয়ানন্দের কথা লিখিত। পঞ্চদশ অধ্যায়টীর নাম 'তুরীয়ানন্দের সিদ্ধান্ত'। এই অধ্যায়টী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীঃ জুন মাসে নিউইয়র্কের ই. পি. ডাটন এ্যাণ্ড কোং কর্তৃক। বইটীর কয়েকটী সংস্করণ হয়েছে। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণের কথায় পরিপূর্ণ এবং ২৫৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই পুস্তকপাঠে ফরাসী মনীষী রোঁমা রোঁলা সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবগত হন এবং পরে তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনী অধ্যয়ন ও রচনা করেন। স্বর্গত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় Caste and Out cast, Gay Neck এবং My Brother's Face প্রভৃতি আঠার বিশখানি পুস্তকের প্রসিদ্ধ রচয়িতা।

মধ্যে একটি কৃষক আমাদের কাছে আসিল। সে আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দের দিকে তাকাইল। পরে সে আমাদের কাছে আসিয়া থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের অগ্রে এই লোকটি কে?' আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন তুমি এ প্রশ্ন করিতেছ?' কৃষকটি এক মূহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, 'এঁর মত কোনও লোকে তাঁহার মস্তক এত উঁচু রাখিতে পারে না। এমন কি, কোনও রাজা বা কোনও ব্যবসায়ী ধনীকে এত উচ্চশির দেখি নাই। যিনি প্রকৃত রাজা, তাঁহার সন্তানের মস্তক এত উন্নত থাকে। ইনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানী।' এমনই ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্ব। ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। সেইজন্য সাধারণ কৃষকের নিকটও স্বতঃই ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছিল।"

"বাগবাজারের এক প্রবীণ প্রতিবেশীর নিকট আমি স্বামী তুরীয়ানন্দের বাল্যজীবনের কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার পিতা একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি হরিনাথকে বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দেন। যোগসূত্রগুলি বাল্যেই হরিনাথের কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। মীমাংসা দর্শনে তাঁহার এত দখল ছিল যে, পিতার অনুপস্থিতিতে তিনি পিতার ছাত্রগণকে উক্ত দর্শন পড়াইতে পারিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি উপনিষদ্ এবং শাঙ্কর ভাষ্য হইতে অধ্যায় ও শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন। যে সকল পণ্ডিত তাঁহার নিকট শাস্ত্রালাপ করিতে আসিতেন তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের উদ্ধৃতির বিশুদ্ধতা ও ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা দর্শনে অবাক্ হইতেন। জনৈক পণ্ডিত তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করেন, 'কিরূপে আপনি এই গভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিপুল ব্যাখ্যান-কৌশল লাভ করিলেন?' বেদান্ত-কেশরী উত্তর দিলেন, "পিতার নিকটই আমি প্রায় সব শাস্ত্র শিক্ষা করি। যাহা বাকী ছিল তাহা গুরুই আমাকে শিক্ষা দেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম আধ্যাত্মিকতার পরিচয় স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকটেই পাইলাম। তিনি বেশী কথা বলিতেন না। কিন্তু যাহা

বলিতেন তাহা শ্রোতার মর্মস্পর্শ করিত। লোকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তির কথা বলে তিনি সেরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলিতেন।"

"অন্য সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসিগণও তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া আমি ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের হৃদয় কিঞ্চিৎ অবগত হই। কিন্তু সকল কথা এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁহার আধ্যাত্মিক উচ্চতা ছিল হিমালয়বৎ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি তাঁহার কাছে বহুবার গিয়াছিলাম। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও অনুভূতিহীন শাস্ত্রজ্ঞান ঘৃণা করিতেন এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনুভূতি প্রশংসা করিতেন। এইজন্য নিরক্ষর মহাতাপস গুরুভ্রাতা স্বামী অদ্ভূতানন্দ তাঁহার এত শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তিনি কাশীধামস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে এক গৃহে থাকিতেন। কক্ষটী উচ্চবৃক্ষশোভিত এবং একতল।

"কাশীর প্রচণ্ড গ্রীষ্মের জুন মাসের প্রাতঃকাল। স্বামী তুরীয়ানন্দের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। ঘরের ভিতরটী শীতল, কিন্তু সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল ছিল না। যেটুকু আলোক ছিল তাহার দ্বারা ঘরের ভিতর সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে ছিল। গৃহমধ্যে একটী খাটে গেরুয়াপরিহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ উপবিষ্ট। তাঁহার তপঃসমুজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিলাম, এই তাপস পবিত্রতার প্রতিমুর্তি। তাঁহার পদধূলি লইয়া আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। এখন তাঁহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম—সেই পুরুষসিংহ বর্ণনাতীত মধুরতা ও কোমলতা আমার উপর বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু, তাঁহার মুখ, এমন কি সাম্‌নে সামান্য হেলান তাঁহার মাথাও প্রেমিক ঋষির মত আমার উপর আশীষ বর্ষণ করিল। কতক্ষণ তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন বলিতে পারি না। আনন্দবিহ্বলতার জন্য আমার সময়-জ্ঞান ছিল না। যখন তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখন দেখিলাম তিনি সহাস্য মুখে বলিতেছেন, 'বাবা! তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

আমি—হাঁ মহারাজ। আপনার গুরুদেব এবং এই মঠ সম্বন্ধে।

স্বামী তু—তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনোভাব তোমরা সকলে জান। তিনি তোমাদিগকে জ্ঞানভক্তি দিন।

আমি—মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যদি একটুও বুঝে থাকি তবে তা আপনাকে দেখেছি বলে।

স্বামী তু—তুমি বল্‌তে চাও, ঠাকুরের হিমালয়াধিক মহিমা আমার মত বামনের কাছে তুমি পেলে?

এই বলিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন। তাঁহার হাসিতে বিদ্রূপ ছিল না, বিরক্তি ছিল। হাসিতে হাসিতে তাঁহার চোখে জল আসিল। স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে সন্তর্পণে চোখের জল মুছিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার প্রশ্নটী আবার বল।'

আমি—মহারাজ, আমার প্রশ্নটী হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না। আমি অনেক কিছু জানিতে চাই। আপনার কার্য্য সম্বন্ধে আমি প্রথমে জানিতে ইচ্ছুক। আপনি অদ্বৈতাশ্রমে না থেকে সেবাশ্রমে থাকেন কেন? নির্গুণ উপাসনা অপেক্ষা কি সগুণ উপাসনা উৎকৃষ্টতর?

স্বামী তুরীয়ানন্দের বাক্যে বা ব্যবহারে ব্যস্ততা ছিল না। তিনি ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন হইলেন। তিনি স্বীয় করদ্বয় যুক্ত করিয়া উহা অন্যমনস্কভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "অদ্বৈতাশ্রমে সাধুরা বেদান্তাদি দর্শন অধ্যয়ন এবং সাধন ভজন নিয়ে থাকে। ঈশ্বর লাভের জন্য তারা আকুল। তাই তাঁর চিন্তায় তারা ব্যাপৃত থাকে। যখন সাধন ভজন করতে পারে না তখন শাস্ত্রচর্চা করে। এইরূপে তারা কায়মনে একই বিষয়ে নিমগ্ন। তাদের নিরবছিন্ন চিন্তাধারা আহার এবং নিদ্রা কালেই ব্যাহত হয়। অধিক নিদ্রাও তাদের হয় না। তাদের জীবন কঠোর। সংসারসুখ ত্যাগের জন্য তাদিগকে এই মূল্য দিতেই হবে।"

অধৈর্য্য সহকারে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহারাজ! আপনি আমাদের সময়ে একজন বিশিষ্ট সাধু। আপনি অদ্বৈতাশ্রমে না থেকে সেবাশ্রমে থাকেন কেন?

স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার হাসিলেন। এবারের হাস্য মৃদু। আনন্দের রশ্মি তরঙ্গ নির্বাপিত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "সামনে যা আসে তাহা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। যারা ভগবদ্‌ভক্ত তারা ঘুঁটে বা পদ্ম যা পায় তাতেই তুষ্ট। কেন আমি সেবাশ্রমে আছি বাবা, তার জবাব পাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। সিদ্ধিলাভের পর যিনি ঈশ্বর হয়ে গিয়েছিলেন তিনিই এই দিকে ছিলেন। তাহলে আমার মত চুনো পুঁটী এদিকে থাকবে না কেন? যারা নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনে রত তারাও জ্ঞানমার্গীদের মতই পুণ্যবান্। সম্ভবতঃ এরা অধিকতর পুণ্যশীল এবং এদের সংখ্যাও অধিক। ঈশ্বর তাদের জন্যই অবতীর্ণ হন মর্ত্যধামে। সুতরাং এই দিকেই মজা বেশী। তোমার মত যারা প্রশ্ন করে তারা এইরূপে আমাদের বৃথা আত্মাভিমান বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ঠাকুর যেমন বলতেন, নিজের জন্য মুক্তি সাধনে তত মজা নাই। আমি আসল মজার কথাই বলছি। কারণ ঈশ্বরই সেরা মজার উৎস। যে দিব্য আলোক লাভ করবে সে তা দিয়ে অন্ধকে দৃষ্টি দান করবে। তাতেই বেশী মজা। তাঁর কাছে যাবার পথ যত বেশী হবে ততই জনমত বাড়বে যে, তিনি আছেন। যদি তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস এবং তাঁকে স্বীয় পথে দেখে থাক তাহলে তোমারই আগ্রহ হওয়া উচিত, অপরকে নিজস্ব পথে ঈশ্বরের দিকে চালিত করা। যদি অন্যান্য ধর্মপথে সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ না করতে পারে তাহলে তুমি কিরূপে জানবে যে, তদ্দৃষ্ট ঈশ্বরই পরম দেবতা? শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে ভারতের চিরন্তন সত্যই শিক্ষা দিয়াছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ নিজের মুক্তি ও অপরের কল্যাণ সাধনই সাধু জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সেবাশ্রম ব্যতীত অন্য কোথাও এই উভয়বিধ সাধন সম্ভব নহে। আমার

মত লোকে সগুণ উপাসনা বা সেবাধর্মই পছন্দ করে। প্রত্যেক নামে, প্রত্যেক রূপে ঈশ্বরই প্রকটিত। সকলকে নীরবতার বজ্রধ্বনি করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য। প্রত্যেক স্ত্রী বা পুরুষের কণ্ঠ মুক্তিরত্নে শোভিত হউক। প্রত্যেক মানবমূর্তি তোমার ঈশ্বরের জীবন্ত বিগ্রহ।"

আমি—আপনি ইচ্ছামাত্রই গুণাতীত হইতে পারেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা না হইয়া কেন আপনি সেবাধর্মের পক্ষপাতী তাহার কারণ এখন বুঝিলাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দ জোরের সহিত বলিলেন, "আমি এই জন্য এদিকে থাকি যে, উভয় পথের মধ্যে ইহাই অধিকতর সহজসাধ্য। ইহাই সরল ও দুর্বলের পথ।"

"এখানে কর্মী, ভক্ত এবং জ্ঞানীর স্থান আছে। কর্মী নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ হইতে পারিলে অচিরে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবে। কিন্তু তাহাকে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের আশা জলাঞ্জলি দিতে হইবে। অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধাই লাভের আশা ত্যাগ করিলে জ্ঞানীও ধ্যান ধারণার দ্বারা ঈশ্বরদর্শন করিতে পারে। যিনি ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণিগণকে ভালবাসেন, তিনি ঐহিক উন্নতি বা স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা না করিলে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। এই সেবাশ্রমে সকল শ্রেণীর সাধক থাকিতে পারেন। ঈশ্বরলাভের ইহা প্রশস্ত ক্ষেত্র। এইজন্য আমি এখানে থাকিতে ভালবাসি। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগের নিকট এই আদর্শ দেখাইয়াছেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের মুখমণ্ডল উৎসাহে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার হস্তদ্বয় তাঁহার ক্রোড়ে উন্মুক্ত ও অসাড় হইয়া রহিল। যদি কেহ তাঁহার কথা বলিবার সময়ে তাঁহার ওষ্ঠযুগলের গতি ও চক্ষুর জ্যোতিঃশিখা না লক্ষ্য করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিবেন, পূর্ণ দৈহিক স্থৈর্য ও মানসিক প্রশান্তিতে তিনি বিমণ্ডিত আছেন। কবি বলিয়াছেন, জ্ঞানী প্রশান্তিতে সমুজ্জ্বল থাকেন। এখন আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা

করিলাম। পাছে তিনি আমার প্রশ্নটি হাসিয়া উড়াইয়া দেন ও ভালভাবে গ্রহণ করেন, সেইজন্য ধীরভাবে আমি আমার প্রশ্নটি উচ্চারণ করিলাম।'

আমি বলিলাম, 'ভগবন্, পাশ্চাত্যের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের কি বাণী ?" তুরীয়ানন্দ স্বামী উত্তর দিলেন, "পাশ্চাত্য অধিকতর ঈশ্বরপরায়ণ হোক্। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিভিন্ন অনুভূতির প্রতিমূর্তি। ধর্ম আমাদের ভাগবত অনুভূতির ইতিবৃত্ত, আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের ধারণামাত্র নহে। পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁহার যে বাণী তাহাই প্রাচ্যের প্রতি তাঁহার বাণী। ঈশ্বরমুখী হও। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি ঈশ্বর দেখিতে পান ? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, হাঁ আমি ঈশ্বর দর্শন করি। কেবল তোমাকে যেমন দেখি তদপেক্ষা নিবিড়ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাই। যদি রামকৃষ্ণ ঈশ্বরদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরতুল্য হইয়াছিলেন, তবে তুমি আমিও পারিব। ধার্মিক হওয়ার অর্থ ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা করা। ঈশ্বর-দর্শন ব্যতীত প্রকৃত ঈশ্বরবিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস অনুভবের অনুগামী। যে বিশ্বাস অনুভূতির পূর্ববর্তী, তাহা অগভীর ও অস্থায়ী।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'কিন্তু বিশ্বাস একটিমাত্র বা ধর্ম একটিমাত্র নহে ; বহু ধর্ম এবং বহু বিশ্বাস প্রচলিত।' স্বামী তুরীয়ানন্দ অনায়াসে আমার প্রশ্নের অর্থ অবধারণপূর্বক উত্তর দিলেন—"ঈশ্বর একই। কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিবার বিভিন্ন মার্গ আছে। যত প্রকার ভাগবত অনুভূতি আছে, তত প্রকার বিশ্বাসও আছে। প্রকৃত ও প্রধান বিশ্বাসসমূহ মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রত্যক্ষানুভূতির বিবরণ মাত্র। দেখ, সূর্য প্রভৃতি স্থূল বস্তুর সম্বন্ধে লোকের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনা কত বিভিন্ন হয়। আফ্রিকাবাসীর সূর্যানুভব হইতে ল্যাপল্যাণ্ডবাসীর সূর্যানুভব সম্পূর্ণ পৃথক্। সূর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন আখ্যায়িকা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত। আফ্রিকাবাসীর বিশ্বাস, সূর্য প্রত্যহ বার ঘণ্টা উদিত থাকে। কিন্তু ল্যাপল্যাণ্ডবাসীর মতে সূর্য বৎসরে ছয় মাস ধরিয়া কিরণ দান

করে। অথচ সূর্য একই। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের অনুভবও তদ্রূপ। যদিও আমরা সকলে একই প্রিয়তমকে অনুভব করি, তথাপি তাঁহাকে বর্ণনা করিবার ভঙ্গী প্রত্যেকের সম্যক্ বিভিন্ন। তথাপি সকলেই তাঁহার অনন্ত ভাবেরই মহিমা কীর্তন ও বর্ণন করে। একই নিরানন্দ অসুন্দর মুখ সব সময়ে না দেখিয়া আমরা এক নামরূপহীনের সহস্র নামরূপ দেখিতে পাই। তাহাতে কি ঈশ্বরের মহিমা বর্ধিত হয় না? তাঁহার একটি ভাব অনুভব করিবার পর আর একটি ভাবে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা সাধকের হৃদয়ে বলবতী হয়। ঈশ্বরের ভাব অনন্ত! তিনি অপরিবর্তনীয় হইয়াও চিরনূতন। বর্ধমান শিশুকে তাহার মাতা যেমন স্বীয় চরিত্রের বিভিন্ন দিক বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া প্রকাশ করে, জগজ্জননীও আমাদিগকে তদ্রূপ করেন। আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা যখন তরুণ থাকি, তখন ঈশ্বর আমাদের পালক ও রক্ষক। সাধনপথে অধিক দূর অগ্রসর হইলে দেখা যায়, তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ সহচর। সাধক আধ্যাত্মিকতায় আরও প্রবীণ হইলে ঈশ্বর আমাদের অনুভূতির প্রতীকরূপে প্রকাশিত হন। সর্বশেষে আমরা আবিষ্কার করি যে, আমাদের অমর আত্মার বিভিন্ন ভাবই ধর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নরূপে অনুভূত হইয়াছিল।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগবান্, সেই পরমাত্মাকে কিরূপে জানা যায়? এত ধর্মশিক্ষক, এত গুরু আমাদিগকে হতবুদ্ধি করেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তৎপরে তিনি ছোট জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের জানালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। পরে বলিলেন, "ঈশ্বরদর্শী গুরু অনেক আছেন। তাঁহাদের একজনকে আশ্রয় কর। যে গৃহে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, তথায় তিনি তোমাকে লইয়া যাইতে পারেন। সেরূপ গুরু যে কোন জাতির বা ধর্মের হইতে পারেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইতে পারেন। কিন্তু একমাত্র তাঁহারই শিষ্য গ্রহণের অধিকার

ও শক্তি আছে। যদি এরূপ কোন মহাপুরুষ দেখিয়া থাক, তাঁহাকে গুরুপদে বরণ কর। তিনিই তোমাকে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন।'

এই সময়ে একজন আসিয়া আমাদের কথোপকথনে বাধা দিলেন। সেইজন্য আমার বাকী প্রশ্নগুলি পর দিনের জন্য স্থগিত রহিল। পর দিবস বৈকাল চারিটার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমোদ্যানের ময়দানে বেড়াইতে বেড়াইতে আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। তখন তিনি একেবারে ভিন্ন ব্যক্তি, সতর্ক ও সবল। চারিপার্শ্বস্থ বস্তু তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। গমনশীল শ্বেতবস্ত্রপরিহিত ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া সেবাশ্রমস্থ কোন কোন রোগীর স্বাস্থ্য-সংবাদ তিনি লইতেছেন। কখনও বা উদ্যানস্থ ঝোপের পার্শ্বে কর্মরত মালীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অমুক ফুলগাছের এই সময়ে কি কি অসুখ হয়? তিনি এইভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা আমার সঙ্গে বেড়াইয়া কাটাইলেন। নানা দিকে মন বিক্ষিপ্ত হইলেও আমাদের প্রসঙ্গ-সূত্র ছিন্ন হয় নাই।

বাগানের মালীর সহিত কথা বলিবার সময় এক বিরাম-ক্ষণে তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার আর কোন জিজ্ঞাসা আছে কি? সেটী কি বাবা?' তখন আমি তাঁহাকে আর একটী প্রশ্ন করিলাম, 'যদি প্রত্যেকেই স্ব স্ব পথে ঈশ্বরলাভ করিতে পারে তবে তাহা যোগমার্গে করিলে ক্ষতি কি?'

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "যোগসাধন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তুমি কি স্বামী শিবানন্দের 'সাধন প্রাণায়াম' শীর্ষক পুস্তিকাটী ভাল করে পড় নাই? পুস্তিকাটী সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্। ভক্ত যোগিগণের কথায় ভ্রান্ত হন না। স্বামী শিবানন্দ ঠিকই লিখিয়াছেন।—যদি তুমি প্রাণায়াম কর এবং মনঃসংযম বাড়াও তুমি শক্তিশালী হইবে। এই সকল উপায়ে দৈহিক স্বাস্থ্যও উন্নত হয়। উপনিষদে আছে, 'ন তস্য

রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।' অর্থাৎ যে শরীর যোগাগ্নিতে বিশুদ্ধ হয় তাহা রোগ, জরা ও মৃত্যু দ্বারা অকালে আক্রান্ত হয় না। ইহা অতি সত্য। যিনি জরাতীত ও চিরতরুণ, তাঁহাকে দর্শন না করিলে চিরযৌবন লইয়া কি লাভ? যোগসাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই আবশ্যকীয় বিষয়টী উপেক্ষা করেন। মনে কর, ঈশ্বর সৌন্দর্য্যস্বরূপ—এই ভাবটীর উপর মনঃস্থির করিতেছ। এইরূপ ধ্যানের কালে মনে এমন বীভৎস চিন্তাপ্রবাহ আসিবে যাহা দেখিয়া তুমি চমৎকৃত হইবে। আবার স্বীয় অনুভব হইতে অপরের অনুভব পর্য্যন্ত সবই তোমার জ্ঞানগোচর হইবে। ক্রমশঃ, দুই এক বৎসর অভ্যাসের ফলে সেই সকল বিজাতীয় চিন্তা প্রশমিত হইলে ধ্যান গভীর হইবে। তখন তোমার দেহও অদ্ভুত আচরণ করিবে। কয়েক মিনিটের জন্য তোমার নিশ্বাসও বন্ধ হইবে। নাড়ীর গতি ধীরতর এবং মন বহির্জগতের জ্ঞানশূন্য হইবে। ধ্যান সুগভীর হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও কিয়ৎকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ধ্যান সমাধিতে পরিণত হয়। অবশেষে সমাধিতে যখন ব্রহ্মলাভ করিবে তখন ভগবানের অসীম সৌন্দর্য্য দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরলাভ হইলে অলৌকিক শক্তিও উপস্থিত হয়।

"এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিগণ ঈশ্বরলাভের পথে যোগবিজ্ঞান আবিষ্কার করেন। ইহা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বহিরঙ্গ সাধনমাত্র। হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ কালক্রমে এক দল ভণ্ড তপস্বী আবির্ভূত হইয়া ঈশ্বর-লাভকে গৌণ এবং যোগশক্তি লাভকে মুখ্য করিলেন। তাঁহারা বিভূতিকামী ছিলেন। তাই তাঁহারা যোগবিজ্ঞানকে অলৌকিক শক্তিলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞানও প্রচার করিলেন। ধর্মের নামে এই সকল অলৌকিকতার বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যদি অসামান্য শক্তি চাও তবে সৈন্য বা দস্যু হও না কেন? যোগকে

এইভাবে যাদুবিদ্যায় পরিণত করা উচিত নয়। আমি অনেক যোগীকে জানি যাঁহারা বহু অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁহারা নিজেদের যতই বড় মনে করুন না কেন, তাঁহারা অতি হীন। এই অর্থে রামকৃষ্ণ যোগী ছিলেন না। তথাপি সব যোগী তাঁহার কাছে হার মানিত। ঈশ্বরানুভূতির সময়ে (সমাধিস্থ অবস্থায়) তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতি, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া স্বতঃই বন্ধ হইত। যৌগিক প্রক্রিয়া না করিয়াও তিনি যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সাবধান বাবা! ঈশ্বরের চিন্তা ও ধ্যান করিলেই তোমার সকল যৌগিক সিদ্ধি করতলগত হইবে। পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক বিষয় এই যে, ঈশ্বরদর্শন হইলে কেহ এই সকল সিদ্ধাইর অপব্যবহার করেন না। নগরের অধিকার পাইলেও যেমন মহাপুরুষগণ উহার ব্যবহার করেন না তদ্রূপ তত্ত্বদর্শীগণ অমরত্ব লাভ করিয়াও উহার অপচয় করেন না। ঈশ্বরজ্ঞ পুরুষগণ যাদুবিদ্যা বা সিদ্ধাই প্রদর্শনে বিমুখ হন। তাহা ছাড়া, আমরা এমন এক যুগে বাস করি যখন লোকের যাদুবিদ্যা বা হঠযোগ সাধনের সময় বা ধৈর্য্য নাই। এই কালে নরনারীগণ কর্ম-ব্যস্ততায় নিমগ্ন। সুতরাং তাহারা অনন্তকে লাভ করিবার সোজা পথ চায়। এই কলিযুগে ঈশ্বরকে আন্তরিক চাওয়াই যথেষ্ট। আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা থাকিলে এই যুগে ঈশ্বর দর্শন নিশ্চয়ই হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে ব্যাকুল ভাবে চায় তাঁহারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই পায়, এমনকি এই চর্মচক্ষে তাঁহাকে দেখিতেও পায়। শিশু যেমন মার জন্য কাঁদে সেইরূপ তাঁর জন্য কাঁদিলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন। গর্ভধারিণী কখনো সন্তানের চোখে জল দেখিতে পারেন না। ইহা নিশ্চয় জেনো। রামকৃষ্ণের কথা স্মরণ কর। ব্যাকুল প্রার্থনা ও ক্রন্দন দ্বারাই তিনি জগদম্বার দর্শন পেয়েছিলেন। তুমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে তুমিও জগন্মাতার দর্শন পাবে। তিনি তোমার অন্তরেই আছেন, কোন সুদূর স্বর্গে বা আকাশে নাই। আহা! এই যুগে তাঁকে

পাওয়া কত সহজ। দেখ বাবা! এখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। এখন ঈশ্বরচিন্তার সময়। আমার ঘরে এস, আমার কাছে বসে ধ্যান করবে। হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

নয়

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পুণ্যস্মৃতি*

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী বৎসরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদ হইতে বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। কলিকাতার জনৈকা স্ত্রীভক্ত দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে সমাগতা। ইহাই তাঁহার প্রথম দর্শন। দীক্ষালাভের অনুমতি পাইয়া স্ত্রীভক্তটী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সমীপে দণ্ডায়মানা। ভাবী গুরুর প্রসন্ন দৃষ্টির দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন, "পবিত্র হতে হবে।" এই কথা শুনিয়া ভাবী শিষ্যার অন্তর চমকিত হইল। সহসা করুণাজড়িত কণ্ঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিলেন, "পবিত্র হতে হবে মানে সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে হবে।" উক্ত বাক্যে শিষ্যার ব্যথিত অন্তর ভারমুক্ত হইল। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার স্থূল ঋজু দেহ এবং করুণা-ভরা ঢলঢলে চোখ দুটী দেখিয়া স্ত্রীভক্তের প্রাণমন আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। মহাপুরুষের ইচ্ছামাত্রই ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি-বিশ্বাস উদিত হয়।

দীক্ষালাভান্তে শিষ্যা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জীবনের পরে কোথায় যাইব? ভবিষ্যৎ অজানা গন্তব্য জগৎ সম্বন্ধে আমার শঙ্কা ও উৎকণ্ঠা ঘুচিবে না কি? আমার সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হইবে না কি? আমি এসব জানিতে কি পারিব না?" গুরু এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া

* শ্রীমতী সুধাময়ী দে কর্তৃক বিবৃত।

শিষ্যার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, জানতে পারবে।" শিষ্যা আবার প্রশ্ন করিলেন, "আমি কি আবার পৃথিবীতে আসবো?" তদুত্তরে গুরু সুকোমল স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠাকুর যখন আবার আসবেন তখন আসতে হবে।" গুরুর আশীর্বাণীতে শিষ্যার অন্তর সংশয়শূন্য ও আনন্দপূর্ণ হইল। মুক্ত গুরু বদ্ধ শিষ্যকে দীক্ষাকালেই মুক্তির আলোক দেখাইয়া দেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সাধারণতঃ কোন শিষ্য বা শিষ্যার বাড়ীতে যাইতেন না। কিন্তু কাহারো আগ্রহাতিশয্য দেখিলে অসম্মতি প্রকাশ করিতেন না। একবার কোন নবদীক্ষিতা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য আকুল হইলেন। শিষ্যার ব্যাকুল প্রার্থনায় গুরু বলিলেন, "আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি কি করবে, একটু সুক্তো খাওয়াবে তো? সে ত আমি রোজই খাই। তার চেয়ে বরং এক গ্লাস জল আমাকে এখান থেকে দাও, আমি খাচ্ছি। তাতেই হবে তো? আমাকে নিয়ে গিয়ে কাজ নাই।" শিষ্যা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। শিষ্যা আবার সাগ্রহে প্রার্থনা জানাইলেন, "আপনাকে একটা বার আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার খুব ইচ্ছা হয়েছে।" গুরু এবার সহাস্যে মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, "যাবো, তবে খাবো না, পুঁটলি বেঁধে নিয়ে আসবো।" খাবার জন্য আর কোন কথা বলিতে শিষ্যা সাহস করিলেন না, কেবল সানন্দে জানাইলেন, "আপনার যেমন ইচ্ছে।"

নির্দিষ্ট দিবসে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উক্ত শিষ্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা। তাঁহার সঙ্গে তিনজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। গৃহের দ্বিতল কক্ষে তাঁহার বসিবার আসন হইয়াছিল। দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির কাছে আসিয়াই তিনি বালকবৎ বলিয়া উঠিলেন, "এই তো এলাম, এখন যাই।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যা সবিস্ময়ে ও সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আপনি উপরে যাবেন যে!" তিনি আর

কোন কথা না বলিয়া মৃদু হাস্যে উপরে উঠিতে লাগিলেন। সিঁড়িতে কয়েকখানা গায়ের শাল পাতা হইয়াছিল পূত পদধূলি সংগ্রহার্থ। তিনি সেগুলি উঠাইয়া লইতে আদেশ দিলেন। ধীরে ধীরে দ্বিতলস্থ কক্ষে যাইয়া চেয়ারে বসিলেন এবং সহাস্য বদনে বাড়ীর সকলের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। অভিনব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে কক্ষটি পরিপূরিত হইয়া উঠিল। সমবেত নরনারীগণ দিব্য আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিলেন। তিনি সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সত্য কথা সকলেই বলবে।" একটী তরুণী তাঁহার সামনে একটি কাঁচের প্লেট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ওকি, প্লেট ভেঙ্গে ফেললে!" তরুণীর পতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া বিজ্ঞান স্বামী বলিলেন, "ওকে আমি খুব বকেছি।" পতি সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আপনার বকাতে ওর কল্যাণ হবে।" শিষ্যার ভগিনীও তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে ও সহোদরাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমরা দুই বোন হই।" তিনি সহাস্যে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "বটে, তোমরা দুই বোন!" উপস্থিত আরো সকলের সহিত এইরূপে তাঁহার কথাবার্তা হইল।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দুই তিন প্রকার পানীয় খাইতে দেওয়া হইল। তিনি সেগুলি পর পর মহানন্দে পান করিলেন। একটি পাথরের থালায় ফল ও মিষ্টি সাজাইয়া তাঁহাকে নিবেদন করা হইল। তিনি এক থালা ফলের মধ্য হইতে কাঁঠালের কোয়া দুইটি তুলিয়া মুখে দিলেন এবং সাদা পাথরের বড় থালা দেখিয়া বলিলেন, "থালাটি তো বেশ।" দীক্ষিতার সহোদরা স্বহস্তে প্রস্তুত চুষি পিঠা দেখাইয়া বলিলেন, "এটা খান।" তিনি বলিলেন, "এগুলি খেতে তো বেশ, কিন্তু খেলে সহ্য হয় না।" দীক্ষিতা বলিলেন, "কিছু হবে না, আপনি খান।" শিষ্যার অনুরোধে গুরু উক্ত দ্রব্য আহার করিলেন। বালীগঞ্জের দইও তিনি একটু খাইলেন। জলযোগান্তে তিনি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। তখন শিষ্যা

করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "আপনার কি কোন জিনিষের দরকার ?" গুরু স্নেহভরা বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া শিষ্যার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার আর কি দরকার ? তোমাদের মঙ্গলই আমার একমাত্র কাম্য।" দীক্ষিতার সহোদরা মণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরবার সময়ে ভগবৎ আনন্দ পাব তো ?" উত্তরে ব্রহ্মজ্ঞ বিজ্ঞানানন্দ বজ্র-দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "মরবার সময়ে কেন, সে আনন্দ এখন হতেই পাবে।"

শিষ্যার পুত্র শান্তি স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে বেলুড় মঠে পৌছাইয়া দিতে আসিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে জানিলেন মহারাজের একটি ফাউণ্টেন পেনের দরকার। তিনি যেরূপ কলম চান সেরূপ কয়েকটা দোকানে পাওয়া গেল না। অনেক সন্ধানের পর ঈপ্সিত কলম পাওয়া গেল এবং টেলিফোনে মঠে খবর দেওয়া হইল। কলম পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং সেবকগণকে বলিলেন, "শীঘ্র যাও, আমার কলম নিয়ে এস।" একজন সেবক অবিলম্বে কলিকাতা যাইয়া কলম আনিলেন। কলমটি পাইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বালকবৎ আনন্দিত হইলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অনেকগুলি ফাউণ্টেন পেন ছিল। তিনি সবগুলিতে কালি ভরিয়া রাখিতেন এবং যখন ইচ্ছা হইত যে কোন একটি দিয়া লিখিতেন। এইরূপে তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উক্ত শিষ্যাকে এক গ্লাস জল দিবার জন্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পূর্বে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন প্রয়োজন না থাকায় তাঁহাকে জল দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য শিষ্যার মনে সেইদিন হইতে এক ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল। একদিন শিষ্যা বেলুড় মঠে গুরুদর্শনে গিয়াছেন। তখনও তাঁহার মনে সেই দুঃখ প্রবল ছিল। তিনি কোন ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া সভয়ে নীরবে গুরুর দিকে অগ্রসর হইয়া জলের গ্লাসটি হাতে উঁচু করিয়া ধরিলেন। তখন গুরুদেব আনন্দিত চিত্তে হাত

বাড়াইয়া গ্লাসটি লইলেন এবং জল খাইতে লাগিলেন, যেন এইমাত্র তিনি জল খাইতে চাহিয়াছিলেন! শিষ্যার ন্যায় গুরুর মুখেও একটি কথাও বাহির হইল না। গুরু শিষ্যের বা শিষ্যার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। ইচ্ছা আন্তরিক হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা অন্তর্যামী গুরুর হৃদ্‌গোচর হয়।

শিষ্য ও শিষ্যার মনে নানা প্রশ্ন উঠিত। তাঁহারা ভাবিতেন যে গুরুর কাছে যাইয়া সব প্রশ্নের উত্তর শুনিবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন তাঁহাকে দর্শনমাত্রই শিষ্যের বা শিষ্যার মনোগত সকল প্রশ্ন বিদূরিত হইত। গুরুর মুখে দুই একটি কথা শুনিলেই তাঁহাদের অন্তর প্রসন্ন ও প্রশান্ত হইয়া যাইত, জিজ্ঞাস্য আর কিছুই থাকিত না।

একবার কোন ভক্ত দম্পতী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নিকট যাইয়া প্রণামান্তে দাঁড়াইলেন। দীক্ষিত পতি সভয়ে নিবেদন করিলেন, "আমরা প্রায় আসি, কিন্তু আপনার মুখের দু'টি কথা শুনিবার সুযোগ পাই না।" এই কথা বলিতেই গুরুদেব সস্নেহে বলিলেন, "এই যে কথা বলছি।" শিষ্য ভক্তিভরে প্রার্থনা করিলেন, "আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের প্রতি ঠাকুরের কৃপা হয়।" তখন তিনি তাঁহার বড় বড় চোখ দু'টি স্নেহভরে মেলিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে জানাবেন। নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করবেন।" ভক্তটি বলিলেন, "আপনার মুখ দিয়ে এই কথা শুনতে চাই, তবেই হবে।" তিনি সেই কথায় দুই হাত উঁচু করিয়া ভক্ত দম্পতীর প্রতি করুণ দৃষ্টি মেলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি বলছি, নিশ্চয়ই হবে। ঠাকুরের পাদপদ্মে তোমাদের শ্রদ্ধাভক্তি হবে, তোমাদের মঙ্গল হবে।" গুরুভক্তিই গুরুকৃপালাভের একমাত্র সর্ত।

কোন দীক্ষিত ভক্ত অতিরিক্ত নস্য ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেক সময় বড়ই অসুবিধায় পড়িতেন। তিনি কলিকাতাবাসী উকিল এবং তাঁহার বাড়ীতে অন্য কেহ নস্য লইতেন না। ভক্তটি বহু বৎসরের অভ্যাস

চেষ্টা করিয়াও ছাড়িতে পারেন নাই। একবার তিনি তিন চার শিশি নামী নস্য কিনিয়া বাড়ীতে আনিলেন এবং বিশেষ কোন কারণে স্থির করিলেন, তিনি আর নস্য লইবেন না। দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাস হইতে নিবৃত্তিলাভের জন্য তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া উপরোক্ত কয়েক শিশি নস্য এলাহাবাদে পার্শেল করিয়া পাঠাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, গুরুদেবকে এই নস্য প্রেরণের পর হইতে একবারের জন্যও তাঁহার আর নস্য লইবার ইচ্ছা হয় নাই, বা আর কখনো তিনি নস্য কিনিয়া আনেন নাই। ২০।২৫ বৎসরের অভ্যাস গুরুকৃপায় আশ্চর্য্যভাবে বিলুপ্ত হইল। আমাদের ভাল-মন্দ যাহা কিছু তাহা যদি আমরা গুরু-পদে বা ঈশ্বর-চরণে নিবেদন করিতে পারি তাহা হইলে সেগুলি হইতে অচিরে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। জন্ম জন্মান্তরের কুঅভ্যাস বা কুসংস্কার গুরুকৃপায় মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শিষ্য-শিষ্যাদিগকে পত্র লিখিতেন না বলিলেই চলে। সেইজন্য তাঁহার পত্র বেশী পাওয়া যায় না। একবার দুই শিষ্যা বেলুড় মঠে তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা আপনাকে এলাহাবাদে চিঠি দিব।" তদুত্তরে তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "হাঁ, তোমরা যত ইচ্ছা চিঠি লিখতে পার। কিন্তু আমি উত্তর দেব না।"

গুরুদেব এলাহাবাদে যাইতেই শিষ্যাদ্বয় তাঁহাকে কয়েক খানা পত্র লিখিয়াছিলেন। একবার একখানা পত্রে উভয়ে গুরুদেবকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিলেন উত্তর দিবার জন্য। সেইবার গুরুদেব দুই জনকে একত্রে একটা কার্ডে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "তোমাদের পত্র পেয়েছি। তোমাদের মঙ্গল হোক্, এই ইচ্ছা করি। ইতি—বিজ্ঞানানন্দ।" জ্ঞানী গুরু সতত শিষ্য-শিষ্যার কল্যাণ কামনা করেন।

বীণা নাম্নী কলিকাতার একটী স্ত্রীভক্ত বেলুড় মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষালাভের কয়েক দিন পূর্ব হইতে বীণার

প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল চিংড়ী মাছের মুড়া এবং মাংস খাইবার জন্য। কিন্তু সুযোগের অভাবে তাহা অপূর্ণ ছিল। দীক্ষা লইবার পর বীণা মঠে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় কোন সাধু একটী প্লেটে চিংড়ী মাছ ও মাংসের তরকারী আনিয়া বীণাকে দিয়া বলিলেন, "গুরুদেব ইহা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বিস্ময়ে ও আনন্দে অধীরা হইয়া শিষ্যা গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। প্রকৃত গুরু শিষ্যের মনের সব কথা জানিতে পারেন এবং পূরণ করেন।

কোন শিষ্যা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি ঠাকুরকে দেখতে পাব?" সিদ্ধগুরু বিজ্ঞানানন্দ প্রসন্ন দৃষ্টিতে শিষ্যার দিকে তাকাইয়া শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখতে পাবে।" দূর হইতে অঙ্গুলি দ্বারা শিষ্যার অন্তঃস্থল নির্দেশ করিয়া তিনি পুনরায় অভয় দিলেন, "ঐখানে দেখতে পাবে।" জ্ঞানী গুরুর কৃপায় শিষ্যের পুঞ্জীভূত অজ্ঞানান্ধকার মুহূর্তমধ্যে অপসৃত হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই বলিতেন, "জাত সাপে কামড়ালে তিন ডাকেই ব্যাঙের প্রাণ বেরিয়ে যায়, বেশী ভুগতে হয় না।"

একদিন দুইজন শিষ্যা স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে বেলুড় মঠে দেখিতে গিয়াছেন। তন্মধ্যে একজনের মন সেদিন সাংসারিক দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত ছিল। শিষ্যাদ্বয় শ্রীগুরুর সম্মুখে যাইয়া প্রণামান্তে দাঁড়াইতেই উভয়ের দিকে তাকাইয়া গুরু বলিলেন, "জান তো তিনটে 'স' আছে—শ, ষ, স। সবই সয়ে যাবে।" উক্ত উপদেশ চিন্তাকুলা শিষ্যার মনে পরম শান্তি ও আশ্বাস আনিয়া দিল। শিষ্যের অব্যক্ত মনোভাব গুরুর অজ্ঞাত থাকে না। জ্ঞানী গুরু অন্তর্দ্রষ্টা।

একদিন সন্ধ্যার পর শিষ্যা বেলুড় মঠে যাইয়া পুরাণ মঠবাড়ীর দোতলায় দেখেন গুরুদেবের ঘরটী বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়া শিষ্যা দেখিলেন, গুরুদেব চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন এবং দুই এক জন সাধু তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। গুরুদেবের শরীর তখন খারাপ যাইতেছিল। সাধু সেবকগণ

শ্রীগুরুর পূত অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতেছেন দেখিয়া শিষ্যার মনে খুব আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, "গুরুদেবের সেবাধিকার লাভের সৌভাগ্য হয়ত কোন দিনই আমার হইবে না।" গুরুদেবের বিশ্রামের ব্যাঘাত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি ঘরের মধ্যে শ্রীগুরু-সমীপে যাইতে সাহস করিলেন না, অন্তরে গুরুসেবার প্রবল বাসনা চাপিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উহার ফাঁক দিয়া গুরুদর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ঘরের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তাঁহার কাছে যাবার জন্য গুরুজী আপনাকে ইঙ্গিতে ডাকছেন।" শিষ্যা ভিতরে যাইতেই বিজ্ঞান মহারাজ নিঃশব্দে ইসারার সাহায্যে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। শিষ্যা মহানন্দে গুরু-সেবায় নিযুক্ত হইয়া ধন্য হইলেন। একটু পরে মহারাজ উঠিয়া স্নানাগারের দিকে গেলেন। সদিচ্ছা আন্তরিক হইলে অচিরে পরিপূর্ণ হয়।

শিষ্যা স্বীয় শারীরিক অসুস্থতার কথা ভাবিয়া একদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চোখ বুজে ধ্যান করতে যদি কষ্ট হয় তবে চোখ খুলে কি ধ্যান হয় না?" গুরু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, তাও হয়। চোখ খুলেও ধ্যান হতে পারে।" শিষ্যা আবার প্রশ্ন করিলেন, "বেশী সময় যদি ধ্যান করতে না পারি?" গুরুর উত্তর হইল, "পনের মিনিট না পার তো এক মিনিট করলেও হবে।"

শিষ্যা—যদি নিয়ম মত ধ্যান-জপে বসতে না পারি, কি করব?

গুরু—সর্বদা মনে মনে মন্ত্র জপলেই হল।

শিষ্যা—খিচুড়ী প্রভৃতি রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিতে পারি কি?

গুরু—হাঁ, পার।

শিষ্যা—ভোগ ইত্যাদি যদি নিয়মমত প্রত্যহ না দিয়ে উঠতে পারি তাহলে কি দোষ হবে?

গুরু—না। যেভাবে যখন যেমন দেবে তাতেই হবে। ভক্তি থাকলেই হল।

শিষ্যা—যদি কোথাও গিয়ে কাপড় ছাড়তে না পারি তাহলে জপ ধ্যান করতে পারি কি ?

গুরু—তখন মনে মনে জপ করলেই হবে।

গুরু শিষ্যাকে স্নেহভরে একদিন এই উপদেশ দিয়াছিলেন—সংসারের কাজ যেটুকু না করলে নয় সেটুকুই করবে, আর বাকী সময় ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখবে।

শিষ্যা স্বপ্ন সম্বন্ধে গুরুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপ্ন কি সত্যি মহারাজ ?" গুরু উত্তরে বলিলেন, "ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখ তা সত্যি।" শিষ্যার মন প্রথম প্রথম একটা অব্যক্ত উদ্বেগে সর্বদা অস্থির থাকিত। সেইজন্য গুরুদেবকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্বদা আমার মন বড় চঞ্চল ও অস্থির থাকে, কি করি ?" উত্তরে গুরু স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। মন শান্ত হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই। নিত্য জপধ্যান অভ্যাস কর।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন শিষ্যশিষ্যাদের সহিত কথা বলিতেন তখন তাঁহাদের মনে হইত, যেন তাঁহারা প্রত্যেকে পাঁচ বছরের শিশুর মত স্নেহময়ী মায়ের নিকট হইতে স্নেহাদর ও সদুপদেশ পাইতেছেন। প্রকৃত গুরু শিষ্যশিষ্যাদের প্রতি মাতৃতুল্য স্নেহশীল হন। গুরুশক্তি মধুর স্নেহরূপে শিষ্যশিষ্যার অন্তরে প্রবাহিত হয়। ঐশ্বর্য যখন মাধুর্যরূপে প্রকাশিত হয়, তখনই আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ ঘটে।

দশ

স্বামী শিবানন্দের কথোপকথন *

(১)

১৯২২ খ্রীঃ ২০শে মে শনিবার রাত্রি প্রায় ১০টা। আহারান্তে মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বের চা-খাবার বারান্দায় বেঞ্চের উপর বসিয়া চা খাইতেছেন। সম্মুখে বড়দা মেজের উপর এবং পার্শ্বে কতিপয় ব্রহ্মচারী ও প্রফুল্ল বাবু প্রভৃতি ভক্ত বসিয়া আছেন। সম্প্রতি মহাপুরুষজী স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বাসুদেবানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বসিরহাটে গিয়াছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি-সভায়। সেই কথাই হইতে লাগিল।

মহাপুরুষ—বসিরহাট মিটিংএ ওখানকার ডেপুটী, মুন্সেফ, উকিল, মার্চেণ্ট প্রভৃতি সকলে যোগ দিয়েছিলেন। ওরা বুঝি ওখানে যা হয় একটা কিছু করে সেখানকার দরিদ্রদের সাহায্য টাহায্য করবার বন্দোবস্ত করবে—এরূপ ইচ্ছে করেছে। ওখানকার নদীতেও জোয়ার-ভাটা খেলে। কিন্তু আমরা ও জল বেশী খাইনি, শুধু ডাব আর সোডার জলের উপরই প্রায় ছিলুম। কলকাতা থেকে দুই তিন ঘণ্টার রাস্তা বইত নয়! এখান থেকে খাবার জন্য ফলটল সবই নিয়ে যাওয়া যায়।

ওখান থেকে মহারাজের জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলুম। দুই তিন ক্রোশ দূর হবে। তারা দেখালে কোন্ স্থানে মহারাজের জন্ম হয়েছিল। সেটি একটি উঁচু ঘরের দাওয়া। মহারাজের ভাইপো তাদের বৈঠকখানায় বসতে বললে। আমি বললুম, "আর আধ ঘণ্টা মাত্র সময় আছে, স্টেশনে গিয়ে বসাই ভাল।" সে বললে, "ওখানে টিনের চালা, বড্ড গরম হবে।

---

* ঢাকার ভক্ত ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি হইতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সংকলিত।

এখানে একটু বসে বিশ্রাম করে যান।" তাই তার সঙ্গে গেলুম। গিয়ে দেখি, ঘর ভরে অনেকগুলি আসন করেছে। বিস্তর মিষ্টি ফলটল দিয়ে জলখাবার আয়োজন। আমরা সবে খেয়ে বেরিয়েছিলাম। আমি শুধু ডাবের জল খেলুম, আর একটু ফল মাত্র মুখে দিলুম, মিষ্টি ছুঁইও নি। কেউ কেউ একটু খেলে।

ওদের অবস্থা ভাল। তাদের জমিদারীর দাম প্রায় লাখ টাকা হবে। বিশ ভাগের এক ভাগ ধরলে বাৎসরিক তার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। মহারাজের পিতারা চার ভাই ছিলেন। বড় ঘর, মেজ ঘর, সেজ ঘর, এরূপ বলে। মহারাজের বিমাতা এখন ওখানেই আছেন, সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে। আমি বললুম, "এখন সময় নেই। গেলেই ত বসে একটু কথাবার্তা কইতে হবে। ওরা আগে মহারাজের সম্বন্ধে এত বোঝেনি। বসিরহাটে মিটিঙে লোকের খুব আগ্রহ দেখে ওদের চোখ খুলেছে। বললে, সামনের রবিবার ওরাও উৎসব করবে, আর মহারাজের জন্মস্থানে যা হয় একটা কিছু করবে।

বড়দা—মহারাজের ছোট বৈমাত্রেয় ভাই সেদিন মহারাজের ব্যারামের সময় তাঁকে দেখতে মঠে এসেছিলেন। ছোকরারা প্রথমে তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। সে আমার কাছে ভারী দুঃখ করেছিল। আমি বললুম, তুমি যে মহারাজের ভাই একথা ওদের বললে না কেন? ওরা ছেলেমানুষ, তোমাকে অপর লোক মনে করেছে।

মহাপুরুষ—সেদিন বসিরহাট যাবার সময় ওখানকার ডেপুটি আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়েছিলেন।—ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, বুক টান করে বসেছিলেন। গলার আওয়াজ বেশ মোটা ও গম্ভীর। এক এক স্টেশনে গাড়ী থামে, আর ওখানকার চৌকিদার এসে তাঁকে সেলাম দেয়। ডেপুটি চৌকিদারদের মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করছিলেন, "কি রে, খবর কি? ধানটান কেমন হয়েছে? চুরি ডাকাতি হচ্ছে না ত?"

লোকটি ভাল। আমাদের সঙ্গে অনেক কথা কইলেন। মহারাজের গ্রামের কথাও তিনি বললেন। ওখানকার লোকগুলি বড় খারাপ ছিল। একবার ম্যাজিষ্ট্রেট ওদের গ্রামে গিয়েছিল। তৃষ্ণা পাওয়ায় জল খেতে চাইলে কেউ তাকে জল দেয়নি। তার উপরে সকলে হয়ত চটা ছিল কোন কারণে। তাই সে খুব চটে গিয়ে গ্রামের নাম রাখলে ঘোষগ্রাম। তাতে গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করেছিল। ডেপুটি বললেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করে পুনরায় উক্ত গ্রামের নামকরণ করেছেন কুলীনগ্রাম।

মহারাজের বাপ খুব বিষয়ী লোক ছিলেন। ঠাকুরের কাছে মহারাজ থাকতেন, এটা তিনি প্রথমে খুব পছন্দ করেন নি। একবার অন্য এক জমিদারের সঙ্গে লাঠালাঠি হয়ে কয়েকটা খুন হয়। আলীপুরের কোর্টে মোকদ্দমা উঠেছিল, তাই তাঁর বড় ভয় হয়েছিল। ঠাকুরের কাছে অনেক বড় বড় লোক—ডেপুটি, উকীল-টুকীল আসতেন। তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন বলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। ঠাকুর তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অধর সেনকে ডাকালেন। অধর সেনের সঙ্গে রাখাল মহারাজের খুব ভাব ছিল। ঠাকুর মাঝে মাঝে রাখাল মহারাজকে অধর সেনের বাড়ীতে পাঠাতেন শরীর একটু খারাপ হলে কয়েকদিন সেখানে থাকবার জন্য। এতে সদালাপে উভয়েরই মঙ্গল হত এবং রাখাল মহারাজেরও শরীরটা একটু তাজা হত কয়েকদিন ভাল খেয়ে দেয়ে। অধর সেন আসতে ঠাকুর বললেন, "অধর, রাখালের বাপ এসেছিল। সে এক মোকদ্দমায় বড় বিপদে পড়েছে। যেমন করে হোক্, তাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করতে হবে তোমায়।" অধর বললেন, "তার আর কি, আমি ওটা করে দেব। আপনি ওর জন্য ভাববেন না।" বাস্তবিক সে মোকদ্দমায় রাখাল মহারাজের বাপই জিতলেন। তখন তিনি বুঝলেন যে, তাঁর ছেলে যেমন তেমন সাধুর কাছে থাকে না।

বেলুড় মঠ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে, রবিবার রাত্রি আটটা। মঠের স্বামী রামানন্দ, অমরানন্দ, অখণ্ড ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধু-ব্রহ্মচারিগণ এবং ঢাকার শৈলেশবাবু ও প্রফুল্লবাবু প্রভৃতি ভক্ত উপস্থিত। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমহাপুরুষজী মঠের সম্মুখস্থ বারান্দায় বেঞ্চের উপরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ কেহ বা বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে গঙ্গা কুলুকুলু নাদে প্রবাহিতা হইয়া মঠের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

দুই তিন দিন পূর্বে মঠের ভাঁড়ার ঘর হইতে কৌটাশুদ্ধ ষোল টাকা চুরি হইয়াছে। এই কথা লইয়া মঠে কয়েকদিন যাবৎ জটলা চলিতেছে। এখনও সেই কথাই উঠিয়াছে, মন্ত্রাদি দ্বারা চোর ধরিবার কথা হইতেছে।

মহাপুরুষ—আমাদের ওখানে একবার এরূপ চুরির গণনা হয়েছিল, কে যেন দীপশিখার মধ্যে চোরের চেহারা দেখেছিল। হাঁ হাঁ, ঠিক মনে পড়েছে—ও আমিই দেখেছিলুম! আমার বয়স তখন খুব কম ছিল, পাঁচ ছয় বৎসর হবে। আমার মায়ের গহনার বাক্স চুরি হয়েছিল। পাঁচ ছয় হাজার টাকার গহনা তাতে ছিল। সেকালের মেয়েরা ত আর সর্বদা গহনা পরে থাকত না, শাঁখা পরেই দিন কাটাত। ছোট্ট একটি টিনের বাক্স করে গহনাগুলি কাঠের সিন্দুকের মধ্যে রাখা ছিল। কখন চুরি হয়েছে, কেউ জানতেও পারে নি। চুরি হবার অনেক দিন পরে মা সিন্দুক খুলে দেখেন, গহনার বাক্স নাই। তার পর একজন লোক এসে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে আমায় বললে, "তুমি এই দীপশিখার দিকে চেয়ে দেখত, কাকে দেখতে পাও।" আমার বয়স তখন পাঁচ সাত বছর হবে। আমি দীপের মধ্যে সে কালো জায়গাটার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠলাম, এ যে মেজ মামাকে দেখছি। একথা শুনে সকলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর কেউ কোন কথা বললে না, গহনার খোঁজও আর করা হল না।

মামাদের বাড়ী আমাদের গ্রামের কাছেই ছিল। বড় মামা আবগারীর দারোগা ছিলেন এবং ছোট মামাও কোথায় কাজ পেয়েছিলেন। মেজ মামা আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন এবং সম্পত্তির কাগজপত্র লিখতেন। শেষে সকলে জানতে পারলেন যে, তিনিই সুযোগমত সিন্দুক খুলে গহনার বাক্স সরিয়েছেন। কিন্তু বাবা এজন্য তাঁকে কিছু বলেন নি, আর মা ত বললেনই না। কিছুদিন পরে তাঁর বিয়ে হল। তখন তাঁর বউকে তো গহনা দিতে হবে! তিনি সেই গহনাই মামীকে দিলেন।

জনৈক ব্রহ্মচারী—মঠে যে ঠাকুরের ইষ্টকবচ পূজিত হয় তা নাকি আপনার বাবা দিয়েছিলেন?

মহাপুরুষ—ঠাকুরের যখন খুব গাত্রদাহ হয়েছিল, তখন বাবা তাঁকে ইষ্টকবচ ধারণ করতে বলেছিলেন। এ সেই কবচ।

জনৈক ভক্ত—আপনি তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন?

মহাপুরুষ—আমি তখন জন্মাইওনি। সে ঠাকুরের সাধনের সময়। আমার বাবা তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। তিনি বারাসতের মোক্তার ছিলেন। তখন বারাসত পৃথক্ জেলা ছিল, আলীপুরের অন্তর্গত হয়নি। আমার বাবা বারাসত জেলার অধিকাংশ জমিদারের—রাণী রাসমণি প্রভৃতির মোক্তার ছিলেন। তিনি টাকাও রোজগার করতেন খুব। তিনি একজন খুব উন্নত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। আমার মনে আছে, তিনি মাঝে মাঝে কামাখ্যা থেকে খরচ দিয়ে তান্ত্রিক সাধক এনে বাড়ীতে মায়ের পূজা, জপ ও পাঠাদি করাতেন। তন্মধ্যে একজন সাধককে দেখেছিলুম, এক বোতল মদ নিয়ে বসতেন; আর তা থেকে একটু একটু খেয়ে সমস্ত রাত জপ করতেন। আর একজন ভট্টাচার্য এসেছিলেন, তাঁর একটা বাঁধা হুঁকা ছিল। তাইতে তামাক সেজে তিনি এমন টান দিতেন যে, মনে হত হুঁকা ফেটে যাবে। বাবা তাঁকে বলেছিলেন, ভটচায মশায়, হুঁকো

ফাটবে যে! তিনি বললেন, দমের চোটে দেবতার আসন পর্যন্ত নড়ে, তা হুঁকা ফাটা আর বেশী কি!

যাক্। বাবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা ত আর আমি জানতুম্ না। ঠাকুরের কাছে পরে শুনেছিলুম। ঠাকুর কাউকে তাদের বাড়ীঘরের কথা বড় জিজ্ঞেস করতেন না। রাখাল, বাবুরাম, যোগেন, শরৎ প্রভৃতি সকলকেই তিনি এক একটা ভাবের চোখে দেখতেন, আর সর্বদা তাদের সঙ্গে সেই ভাব নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। একদিন কেন কে জানে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "ওরে, আমার কেন জানি না, তোর বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোর বাড়ী কোথা বল দেখি?" আমি আমার জন্মস্থানের নাম করতেই আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর বাপের নাম কি?" আমি বললাম, "কানাই ঘোষাল।" তখন তিনি বললেন, "ওরে সে যে একজন খুব উঁচুস্তরের সাধক ছিল! একখানা লাল চেলি কাপড় পরে সে কালীঘরে বসে জপ করত। সঙ্গে একজন লোক সে নিয়ে আসত। লোকটি তার পিছনে বসে মায়ের গান করত, আর তোর বাপের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে যেত। তারপর সে যখন বেরিয়ে আসত, তখন আমি দেখতুম যেন ভৈরব আসছে, তার চোখ দুটো লাল হয়ে থাকত। আমার তখন ভয়ানক গাত্রদাহ হয়েছিল; গায়ে এত জ্বালা হত যে, গায়ের লোমগুলি পুড়ে গিয়েছিল! আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম, 'ওগো, তুমি ত অনেক রকম জান। বলতে পার, আমার এরকম গা-জ্বলে যায় কেন? এ কি করে দূর করা যায়?' সে আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বলেছিল। তাতেই কিন্তু আমার গা-জ্বালা সেরে গেল।"

জনৈক ব্রহ্মচারী—কবচ কে করে দিয়েছিল?

মহাপুরুষ—তা জানি না। তিনি কেবল এই কথাই বলেছিলেন।

জনৈক ব্রহ্মচারী—আপনি ঠাকুরকে প্রথম কোথায় দেখেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে?

মহাপুরুষ—না। রামবাবুর বাড়ীতে। আমি যে অফিসে কাজ করতুম, রামবাবুর মামা-শ্বশুরও সেই আফিসে কাজ করতেন। তিনি ঠাকুরের কাছে যেতেন রবিবার; আর সোমবার আফিসে এসে বলতেন, "কাল ঠাকুরের সঙ্গে এই এই কথা হল।" আমি ছোট বেলা থেকেই একটু একটু সাধনভজন করতুম। তখন ব্রাহ্ম ধর্মের উপরই আমার ঝোঁক ছিল। কেশববাবুর প্রচারিত 'ধর্মতত্ত্ব' নামক কাগজখানায়ও ঠাকুরের সম্বন্ধে পড়েছিলুম। সে কাগজখানা এখনও বেরোয় ব্রাহ্ম সমাজ থেকে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কোথায় বা কোন পথে যেতে হয় তা জানতুম না। তারপর আমাদের আফিসের সেই বাবুটি আমায় বলেছিলেন, বালীর খাল যেখানে গঙ্গায় এসে পড়েছে, তার ওপারেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী এবং সেই খানে পরমহংসদেব থাকেন। এক শনিবার আফিসে সেই ভদ্রলোক আমায় বললেন, "দেখুন, আজ পরমহংসদেব আমার ভাগ্নীজামাই রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে আসবেন। আপনি সেখানে যাবেন; তাহলেই তাঁকে দেখতে পাবেন।" আমি বললাম, "আমি যে আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকি তার খুব কাছেই রামবাবুর বাড়ী। আচ্ছা, আমি যাব।" সে বাড়ী কতটা দূর হবে জান? এখান থেকে ঐ গোল ঘরটা যতদূর।

বহু দিন থেকে আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছিল, সমাধিটা কি তা জানবার জন্য। ধ্যানট্যান করতে করতে হয়ত মাঝে মাঝে আঁচ পেতুম, সমাধিতে সম্ভবতঃ মনের অবস্থা এরূপ হয়। কিন্তু ওটা ঠিক বোঝবার জন্য খুব ইচ্ছে হয়েছিল। অনেককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করেছি, কিন্তু কেউ বিষয়টা ঠিক ভাবে বোঝাতে পারে নি। একজন কেবল বলেছিলেন, "কলিতে কারুর সমাধি হয় না। কেবল একজন লোকের হয় দেখেছি। তিনি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।"

সে দিন বৈকালে আমি রামবাবুর বাড়ীতে গেলুম। গিয়ে দেখলুম, এক ঘর লোক। ঠাকুরের তেমন হুঁস নাই, অর্ধবাহ্য অবস্থা। আমি

যে সমাধির কথা এতদিন ধরে এর ওর কাছে জানতে চাচ্ছিলুম, তিনি সেই অবস্থায় অনর্গল কেবল সেই সমাধির কথাই বলছেন।

জনৈক ব্রহ্মচারী—সমাধি সম্বন্ধে সেদিন কি কি কথা হয়েছিল, মহারাজ ?

মহাপুরুষ—সে অনেক দিনের কথা। আমার কি আর সব মনে আছে ? তবে এইটুকু কেবল মনে আছে যে, তিনি বলেছিলেন নির্বিকল্প সমাধির কথা এবং কলিতে নির্বিকল্প সমাধি খুব কম লোকেরই হয়। সমাধি হলে একুশ দিনের বেশী তার দেহ থাকে না। সালকিয়াতে শ্যাম মুখুজ্জের নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। তার দেহ একুশ দিন মাত্র ছিল।

(৩)

বেলুড় মঠ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ। মিস্ ম্যাকলাউড, ব্রহ্মচারী শঙ্কর ও ঢাকার ভক্ত প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত।

স্বামিজীর মার্কিন শিষ্যা মিস্ ম্যাকলাউড কয়েক মাস যাবৎ মঠস্থ অতিথিশালায় বাস করিতেছেন। অপরাহ্ণ প্রায় ছয়টার সময় উক্ত বৃদ্ধা মার্কিন মহিলা মহাপুরুষজীর সহিত আলাপ করিবার জন্য পুরাণ মঠবাড়ীর দোতলায় আসিয়াছেন। গঙ্গার দিকের বারান্দায় তাঁহার বসিবার জন্য একখানি মোড়া দিয়া ব্রহ্মচারী শঙ্কর মহাপুরুষজীর জন্য একখানি চেয়ার আনিলেন। বৃদ্ধা ম্যাক্লাউড এবার আমেরিকা হইতে আসিবার সময় জেরুজালেমের একগাছি মালা (রুদ্রাক্ষের মত) আনিয়াছেন। মহাপুরুষজী আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। ম্যাক্লাউড তাঁহাকে উক্ত মালা জপ করিবার জন্য উপহার দিলেন, কিন্তু মহাপুরুষজী প্রায়ই জপ করেন না বলিয়া উহা ফিরাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর কথা উঠিল যে, ম্যাক্লাউড ঢাকায় যাইবেন। মহাপুরুষজীর নির্দেশে জনৈক ব্রহ্মচারী ঢাকার ভক্ত প্রফুল্লবাবুকে ডাকিয়া আনিলেন। প্রফুল্লবাবু

উপস্থিত হইলে মহাপুরুষজী ম্যাক্‌লাউডের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সান্ধ্য আরতি আরম্ভ হইল। আরতির ঘণ্টা শুনিয়া বৃদ্ধা ম্যাক্‌লাউড মহাপুরুষজীর নিকট বিদায় লইয়া ঠাকুর-ঘরে গেলেন এবং অবনত জানুতে আরতি দেখিতে লাগিলেন। আরতির স্তব গান হইতেছে—"খণ্ডন ভব বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।" মহাপুরুষজী ব্রহ্মচারী শঙ্করকে বলিলেন, "ওখানে লোক কম আছে। তাই স্তোত্রপাঠ জমছে না, তুমি যাও।" শঙ্কর মহারাজ উঠিয়া ঠাকুর-ঘরে গেলেন।

ঢাকার ভক্ত—মহারাজ, একটা কথা ভুলে যাবার আগে আপনাকে এখনই বলতে চাই। কথাটা এই মিস্ ম্যাক্‌লাউড এবং মিসেস মুখার্জি প্রভৃতি ঠাকুর-ঘরের মধ্যে গিয়ে আরতি দেখেন। অন্য কোন সাহেব বা মেম আসলে তাঁরা ঠাকুর-ঘরের মধ্যে যেতে পারেন কি?

মহাপুরুষজী—কেন পারবে না? অবশ্য জুতো খুলে বাইরে রেখে যেতে হবে।

ঢাকার ভক্ত—আচ্ছা, যদি কোন মুসলমান ঠাকুর-ঘরের মধ্যে যেতে চায়?

মহাপুরুষজী—হাঁ, তারাও পারবে। এইত সেদিন মহম্মদ আলী, লিয়াকত আলী প্রভৃতি এসেছিলেন। তাঁরাও ত ভেতরে গিয়ে ঠাকুর দর্শন করলেন। এখানে সেকালের ধর্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামি নেই।

ঢাকার ভক্ত—হাঁ মহারাজ, আমারও ত তাই মনে হয় যে, ঠাকুর-ঘরে সমস্ত ধর্মের লোক অবাধে প্রবেশ করতে না পারলে ঠাকুর যে সর্ব ধর্মের গুরু, তা লোকে বিশ্বাস করবে কিরূপে? ঢাকার ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিস্ সাহেব আমাদের এই ভাবটি দেখে খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বাংলার তদানীন্তন লাট সাহেব লর্ড কারমাইকেলকে ঢাকা মঠে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন।

এই কথা বলিয়া ঢাকার ভক্ত আরতি দেখিতে চলিয়া গেলেন।

এগার

স্বামী শিবানন্দের পনের খানি পত্র *

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বাসাভাঙ্গুডি পোঃ, বাঙ্গালোর সিটি
১০।৮।২৪

শ্রীমান ভুবনমোহন

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

"আপনাতে আপনি থেকো যেও না মন কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সে পরশমণি যা চাবি তা দিতে পারে।
(ওরে) কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥"

ঠাকুর এই গানটী প্রায়ই গাহিয়া অনেককে উপদেশ দিতেন। এই হল পাকা বেদান্ত জ্ঞান। ইহা উপলব্ধি হয় তার, যে কেবল তাঁর নাম হৃদয়ে জপ করে ও আন্তরিক প্রার্থনা করে, "প্রভু উদয় হও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, তুমি অন্তশ্চক্ষু খুলে দাও। তুমিই হৃদয়ের চৈতন্য দেবতা। হৃদয়ে উদয় হও। অজ্ঞান নাশ হইয়া যাউক, মানব জনম সফল হউক।" নাম করা, ধ্যান করা উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য, সেই প্রাণনাথ চৈতন্যদেবকে জানা, যিনি সর্বদা সদাকাল সকল হৃদয়ে থাকিয়া প্রাণ মন বুদ্ধি সকলকে চালাইতেছেন। গীতায় (১৮।৬১) আছে—

---

* বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দকে লিখিত এবং অদ্যাপি অপ্রকাশিত। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পত্র স্বামী শিবানন্দজী কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

অতএব এই হৃদয়েই তাঁকে উপলব্ধি করিতে হইবে ভক্তিভরে তাঁর নাম জপ, প্রার্থনা ও ধ্যান দ্বারা। ঠাকুরই হৃদয়ের সেই আত্মচৈতন্যদেব। প্রণব সংযুক্ত করিয়া মন্ত্রজপ কর, ইহা উত্তম। উপলব্ধি তাঁর কৃপায় হয়, সেই অন্তরস্থ চৈতন্যদেব ঠাকুরের কৃপায়ই হয়। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তোমার হৃদয়নাথ ঠাকুর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। হতাশ হইও না। এ রাজ্য স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় পাশ করার মত নয়। পড়িলাম, মনে রাখিলাম, প্রশ্ন আসিল, উত্তর লিখিলাম, পাশ করিলাম। এ সকল নিয়ম স্কুল-কলেজে পড়ার ও পাশ করার সম্বন্ধে খাটে। তবে এর মধ্যে কোনটুকু ধর্মরাজ্যে লাগাতে হবে? মনঃসংযম (concentration)। যে ছেলেরা খুব মনঃসংযম করে পড়তে পারে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মনঃসংযমের সহিত তাঁর কৃপায় যদি তিনি তাঁর নাম জপ করিতে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু আনন্দ ও প্রেম দেন তাহা হইলে জীব শীঘ্রই কৃতকার্য্য হয়। কৃপা কৃপাহি কেবলম্। তোমার হবে, কোন চিন্তা নাই। এখন তোমার পাঠ্য জীবন। অগ্রে উহা শেষ কর। তারপর বিশেষ উন্নতি বুঝিতে পারিবে। ইহার মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু আভাস পাইবে, যদি নিয়মিতরূপে সংযত ভাবে তাঁর কৃপায় তাঁর নাম ঠিক ঠিক করিতে পার।

'হৃদয়ে এক ঠাকুরের মূর্তি ধারণা করিয়া নাম, নাম (তোমার ইষ্টমন্ত্র) জপ করিলেই সমস্ত হইবে। অবশ্য অন্য যেরূপ করিয়া থাক—যথা হৃদয়ে মা, ঠাকুর ও স্বামিজীকে এবং মস্তকে শ্রীগুরু ও ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণ এবং প্রাচীন আচার্য্যগণকে বসাইয়া যম নিয়ম ইত্যাদি কতকগুলি গুণের চিন্তা কর—ইহাও খুব ভাল। তুমি অখণ্ডানন্দ ও শান্তানন্দ স্বামীদের সহিত পরিচিত হইয়াছ এবং তাঁরা তোমায় ভালবাসেন শুনিয়া

বড়ই আনন্দ হইল। তাঁরা খুব উন্নত সাধু। তাঁরা ঠাকুর, স্বামিজী ও শ্রীমার খুব ভক্ত। আমার শরীর মন্দ নাই। ঠাকুরের ইচ্ছা যখন হবে তখন আবার সাক্ষাৎ হবে। তোমার উন্নতি হবে, কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে। এখন ভাল করিয়া পড়াশুনা করিয়া পাশ করিয়া বাহির হইয়া আস ঠাকুরের কৃপায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—মন্ত্রের অর্থ আর কিছুই নয়, ভগবান হৃদয়ের চৈতন্যদেব। নাম ও নামী অভেদ। যে নাম সেই হরি। নাম ব্রহ্ম। ইহা ছাড়া মন্ত্রের অন্য অর্থ আমি কিছুই জানি না। ঠাকুরের কাছে ইহা আমি শিখিয়াছি। মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দের অর্থ সেই ভগবান।...বাহ্যিক মন্দিরাদি দর্শন, শাস্ত্রাদি পাঠ, সাধুসঙ্গ ও তাঁদের সহিত ধর্মালাপ, এসব কেবল নিজ অন্তরের ভাবোদ্দীপক। এসবও করা চাই উদ্দীপনার জন্য।

(২)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
খার রোড, বান্দ্রা পোঃ, বোম্বাই—২০
১৫।১।২৫

শ্রীমান্ ভুবন,

তোমার পত্রে সব সংবাদ পাইয়াছি। আমি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে খুব সম্ভব মঠে ফিরিব। সেই সময় সব কথাবার্তা হইবে। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব। কৃপার জন্য তাঁর কাছে প্রাণের সহিত প্রার্থনা ব্যতীত আর কোন উপায় আমি জানি না। তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন, ডাকলেই দেখতে পাবে। এ পথে তাড়াতাড়ি কিছুই হয় না। এই প্রার্থনা করিলে, পর মুহূর্তে অমনি তার ফল হইল কি না দেখিতে চাহিলে তাহা হইবার নয়। প্রার্থনা সদা সর্বদাই করিতে থাক। যখন তাঁহার

ইচ্ছা হইবে তখন তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন। প্রার্থনা দ্বারা তিনি বড় নিকট হইয়া পড়েন, বড়ই আপনার হইয়া যান। তখন মানব শান্তি পায়। ব্যস্ত হইলে চলিবে না, ধর্মপথে বড়ই ধৈর্য্যের প্রয়োজন। প্রাচীন কুসংস্কার সকল তাঁহার সতত স্মরণে দমিত হইয়া যায়। যে বস্তুকে যে খারাপ বলিয়া ধারণা করে সে তাহা পরিহার করিতে পারে, বিচার ও প্রার্থনা দ্বারা। এই সকল কথা বেশ অনুধাবন করিয়া বুঝিবে। ধর্মপথে মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই। এ আধ্যাত্মিক রাজ্য, বিষয়ের ব্যাপার নয়, আস্তে আস্তে এগুতে হবে।

হোমিওপাথ ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশ্বাস কর এবং তাঁহার চিকিৎসাধীন থাক। আর আর বিষয় যাহা লিখিয়াছ আমি সে সব কিছু জানি না বা বুঝি না। বুঝি কেবল তাঁর কাছে কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য, বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি ও পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা। Flesh beautyর (দৈহিক সৌন্দর্য্যের) দিকে নজর দিবে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মুখের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করিবে না, পায়ের দিকে ছাড়া। এইরূপ করিতে থাক, অভ্যাস হইয়া যাইবে এরূপ করিতে করিতে। অভ্যাসের দ্বারা সব সম্ভব হয় তাঁর কৃপায়। কৃপার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করিবে প্রাণের সহিত। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে। ঠাকুর বড় দয়াময়, প্রত্যক্ষ চৈতন্যময় কৃপাময়। অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া নররূপ ধারণ করিয়াছেন সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত। অতএব, আমি তাঁর একজন দাস হইয়া তোমাকে বলিতেছি, তিনি তোমার অন্তরে, তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রহিয়াছেন। প্রার্থনা কর কাতরে, যেরূপ বালক পিতামাতার নিকট আব্দার করিয়া কোন জিনিষ চায়। পত্রে আর অধিক কি লিখিব। আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানিবে। ঠাকুর তোমার পরম কল্যাণ করুন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

গোদাবরী হাউস
উতকামন্দ, মাদ্রাজ
১৬।৯।২৬

শ্রীমান্ ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। এতদিন তুমি সম্ভবতঃ দেওঘরে গিয়াছ। তোমার চক্ষের দৃষ্টি অনেকটা খুলিয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আরও এক বৎসর চিকিৎসা করিলে সম্পূর্ণ খুলিবে, ইহা প্রভুর কৃপায় বড়ই আনন্দের কথা। আমার মনে হয়, উহা করাই ভাল। দেওঘর তোমার খুব ভাল লাগে, চিকিৎসা ওখানেও হইতে পারে। তাদের সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা ভালরূপে কহিয়া ঐখানেই থাক, চিকিৎসা কর এবং যথাসাধ্য তাঁর কাজও কর। শিক্ষাবিভাগের কাজ তোমার ভাল লাগে, তাই কর। তোমার মনে যে ভাব হইয়াছে তাহা তাদের সঙ্গে বেশ পরিষ্কার করিয়া কথাবার্তা কহিলে সব মিটিয়া যাইবে, আমার মনে হয়। কারণ, তোমরা সকলেই ত্যাগী। ভগবান লাভের জন্য ভজন সাধন ও জীবসেবা যথাসাধ্য করা—এই তো তোমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এইত স্বামিজীর মিশনের প্রধান মুখ্য আসল আদর্শ। সেবকদের ভিতর এই ভাবটি পাকা দৃঢ় ভাবে থাকা চাই। তাহা হইলে পরস্পর মনোমালিন্যের কোন কারণ থাকিবে না। যাই হোক, তুমি দেওঘরে থাকিতে চেষ্টা কর ঠাকুরের ইচ্ছায়। অন্য কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা এখন মনে আনিও না। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। আমি খুব সম্ভব অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এখান হইতে বাঙ্গালোরে বা মাদ্রাজে যাইতে পারি। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল রোড, বাসাভাঙ্গুডি পোঃ
বাঙ্গালোর সিটি
১৮।১০।২৪

শ্রীমান্ ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার ৺বিজয়ার শুভ আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। গুরুকৃপা উপলব্ধি করিতে হইলে খুব সাধন ভজন করিতে হয় এবং ইহার জন্য খাটতে হয়। মুখে কেবল গুরুর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া তমোগুণের লক্ষণ জানিবে। ভগবৎকৃপা, কিম্বা গুরুকৃপা ততই বুঝিতে পারিবে যতই সাধন ভজন করিতে থাকিবে। বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতে। সুতরাং চিঠির দ্বারা ভার দেওয়া চলে না। গুরু তখনই শিষ্যের সমস্ত ভার লন যখন শিষ্য কঠোর সাধনভজনের দ্বারায় নিজেকে তাঁর পাদপদ্মে surrender (সমর্পণ) করে। শিষ্য তখন ভিতর হইতে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে যে, গুরু তার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্র, গুরু ও ইষ্ট—এই তিন এক। ইহা ধারণা করিবে ও সেইমত ধ্যান ভজন করিবে। মন যখন শুদ্ধ হইতে থাকে তখন ইহাই গুরুর কাজ করিয়া থাকে। যতই তাঁর ভজন করিবে ততই ইহা বুঝিতে পারিবে।

শরীরের অসুস্থ অবস্থায় মঠে থাকিয়া কি হইবে? প্রথমে শরীর সুস্থ কর। চক্ষুর চিকিৎসাদি ভালরূপে করাইবে। তার পর এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। আমি বোধ হয় নভেম্বর মাসের শেষাশেষি মঠে ফিরিব। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীহাতিরামজী মঠ
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
১৪।৬।২৬

শ্রীমান্ ভুবনমোহন,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমরা ৪ঠা জুন এখানে আসিয়াছি। মাদ্রাজ ভয়ানক গরম হইয়া উঠিয়াছিল। এ স্থান সুন্দর ও শীতল। ইহা সমুদ্রতীর হইতে ৮০০০ ফিট উপরে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা মাদ্রাজ গভর্ণরের গ্রীষ্মনিবাস, যেমন দার্জিলিং বাংলার। ইহা অতি শোভাময় পর্বত।

তুমি একবার পিতামাতার কাছে গিয়াছ, খুব ভালই হইয়াছে। চক্ষুর চিকিৎসা একবার চেষ্টা করিবে খুব ভাল। প্রার্থনা করি, ঠাকুরের কৃপায় চোখটা ভাল হয়ে যাক্। বেশ কথা, যদি ইষ্টমূর্তি চক্ষুর সামনে রেখে ধ্যান করার সুবিধা বোধ কর, তাহাই কর। তাঁর কৃপায় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, তাঁর চিন্তায় তোমার মন খুব জমে যাবে। খুব প্রার্থনা করবে ঠাকুরের কাছে, বালকের ন্যায় কাঁদবে। দেখ না, ঠাকুরের জীবনে কেবল 'মা মা' করে কাঁদা ও প্রার্থনা ছাড়া তিনি কিছুই জানতেন না। তা থেকেই তাঁর ভাব সমাধি সব এসেছিল। তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই জগতের আদর্শ ও শিক্ষার বিষয়। যে সেই পথ অবলম্বন করিবে তার সিদ্ধি নিশ্চয়ই। প্রাণের অনুরাগ, প্রাণের টান যত হবে ততই তাঁর কাছে পৌঁছিবে। এই হল আসল কথা। তোমার হবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি তুমি জানিবে।

আমরা ভাল আছি। এ স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। বেশী দিন এখানে

থাকা হবে না। কারণ, এ স্থানে বর্ষা ভয়ানক। বাংলার যেরূপ চেরাপুঞ্জী এ অঞ্চলের সেরূপ উতকামণ্ড। ঠাকুরের ইচ্ছায় এখানেও একটী ছোটখাট মঠ কয়েকটী গৃহস্থ ভক্ত করিতেছেন। ৬।৭ মাসের মধ্যে ইহা হইয়া যাইবে বোধ হয়। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বাসাভাঙ্গুডি পোঃ, বাঙ্গালোর সিটি
১৯।১১।২৪

শ্রীমান্ ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি সর্বদা স্মরণ রাখিও যে, তুমি তাঁর আশ্রয়ে আছ ও তিনি তোমাকে সর্বদা দেখিতেছেন ও রক্ষা করিতেছেন। যাহা কিছু হইতেছে সব তাঁর ইচ্ছায় হইতেছে। ইহাতে তোমার কোন হাত নাই। তুমি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাক। হতাশ হইবে না, মনে কিছুমাত্র দুর্বলতা আনিও না। তিনি তোমার ভার লইয়াছেন। এখন তুমি তোমার যাহা কিছু ভাল মন্দ সব তাঁর উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা কর। কিছু চিন্তা নাই, খুব তাঁহাকে ডাকিবে। তিনি মঙ্গলময়, নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করিবেন। ইহা স্মরণ রাখিও ও বিশ্বাস করিও। তিনি তোমার নিশ্চয়ই একটা উপায় করিয়া দিবেন। আমি শীঘ্রই মঠে যাইতেছি। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথাবার্তা কহিব। তুমি চক্ষুর চিকিৎসাদি পূর্ববৎ করিয়া যাইও। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীমান্ ভুবনমোহন,

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম। তুমি শ্রীভগবানের দিকে না দেখিয়া কেবল নিজের দিকেই দেখিতেছ। তাই তোমার মনে এত কষ্ট। ...যতক্ষণ এরূপ ভাবনা ভাবিবে ততক্ষণ মনে কষ্ট পাবে। ওরূপ ভাবনা একেবারে চিরদিনের মত মন থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। কেবল তাঁর কৃপার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহলে ভিতর থেকে আলোক পাবে, তাঁর কৃপা অনুভব করিবে, শান্তি পাবে। নতুবা এরূপ ভাবনা যত ভাবিবে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া চির দিনের মত পৃথিবীতে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া যাইবে, জগতের একটী বোঝা হইয়া পড়িবে।

সেইজন্য তোমায় বলি—কেবল ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, জপধ্যান কর, পড়াশুনা কর এবং যথাসাধ্য তাঁর কাজ কর। ভবিষ্যতের ভাবনা মনে একেবারে আসিতে দিও না। বর্তমানেও যিনি ভবিষ্যতেও তিনি। ভক্তের নিকট তিনি সর্বদাই বর্তমান। ভবিষ্যতের দুর্দ্দশার কথা ভাবা নাস্তিকের স্বভাব। সেটা যেন তোমার না হয়। তাহা হইলে জীবনের সর্বস্ব হারাইয়া ফেলিবে। ঠাকুর পরম দয়াল। আশ্রিত জনের একমাত্র সম্বল। একান্ত তাঁর শরণাপন্ন হও, শান্তি পাবে।

ইন্দু মঠে নাই, কলিকাতায় আছে। সে যদি মালা আনে আমি জপিয়া দিব। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময়, ইহা আমি নিশ্চয়ই জানি। তুমি অত আমার, আমার করিও না। তাহলে নির্ভর আসে না। তুমি যতই অপরাধ কর না কেন ইহজন্মে বা পরজন্মে, ঠাকুর পরম দয়াল অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। ভক্ত প্রাণ থেকে তাঁকে ডাকিলেই তিনি কৃপা করেন। তার দুষ্কৃতি যদি থাকে ডাকার জন্যই সব

কেটে যায়। তিনি অহেতুক কৃপাময়, নিশ্চয়ই জানিও। ওখানকার কাজকর্ম বেশ চলিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অনঙ্গের ক্লাস বেশ চলছে শুনে খুব সুখী হইলাম। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

পোঃ বেলুড় মঠ
জেলা হাওড়া (বাংলা)
২৯।৬।২৮

শ্রীমান্ ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। মানুষ ত আর perfect (পূর্ণ) নয়; মনে কাম, ক্রোধ অবিশ্বাসাদি আসবে বৈ কি? এ সব আসে, ভাল ভাবও ত সব আসছে। এ সব হবেই। তাই নিয়ে তাঁর মুখ চেয়ে struggle (সংগ্রাম) করতে হবে বৈ কি? তা না করলে কি করে হবে বল? পা পিছলে যাবে, পড়ে যাবে, আবার তাঁর নাম নিয়ে নূতন উদ্যমে লাগতে হবে। লেগে পড়ে না থাকলে কি তাঁর দয়া ও করুণা লাভ করা যায়? Struggle (সংগ্রাম) ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকবার ত আর জো নাই। তিনি ছাড়বেন কেন? অতএব বিচলিত না হয়ে ঠাকুরের আশা-বাণীর উপর বিশ্বাস রেখে struggle করে যাও। একদিন না একদিন তিনি তোমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। তাঁকে পাবে নিশ্চয়ই। তোমরা ঠাকুরের কাছে এসে পড়েছ। তোমাদের অল্প চেষ্টায় বেশী কাজ হবে।

আমার শরীর এক প্রকার। তুমি আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুরের কৃপায় তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করুক। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

পোঃ বেলুড় মঠ

জেলা হাওড়া (বাংলা)

৮।৯।২৮

শ্রীমান্ ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ধ্যান জপ পূজা পাঠ লইয়া আছ জানিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। তাঁর কৃপায় ভক্তি বিশ্বাস নিশ্চয়ই লাভ হইবে। ঠাকুরের আশ্রয়ে আসিয়াছ, তাঁহাকে ধরিয়া থাক। আধ্যাত্মিক সম্পদ হইতে কেন বঞ্চিত হইবে? ভক্তি বিশ্বাসই আসল। তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। দর্শনাদির জন্য ব্যস্ত হইও না। দর্শন ত সর্ব সময় হইতেছে। তিনি ত সর্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। জগৎই তাঁর বিরাট রূপ। লোকে তা দেখে কৈ?

আমার শরীর এক প্রকার তাঁর কৃপায় চলিয়া যাইতেছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুরকে খুব ডাকবে, তাঁর কাছে খুব প্রার্থনা করবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(১০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়
২২।৪।২৬

শ্রীমান ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমার বাবা মৃত্যু-শয্যায়। তোমার প্রথম উচিত এই সময় তাঁর সেবা করা, তাঁকে দেখিতে যাওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমাদের বুদ্ধি সুদ্ধি এরূপ কেন বুঝিতে পারি না। এ অবস্থায় যদি পিতা বা মাতার সেবা করিতে না পার, ধর্ম কি হবে জানি না। ওখানে বিদ্যাপীঠে কতগুলি ছেলের সেবা করিতেছ, অথচ বাপ মৃত্যু-শয্যায়; তাঁর সেবা করিবে না? তোমাদের প্রথমে বুদ্ধি সুদ্ধি ভাল হোক, এই আশীর্বাদ করি। আমার শরীর মন্দ নয়। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া জেলা
১১।৫।২৭

শ্রীমান ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। সাধ্যমত তুমি ঠাকুরের স্মরণ, মনন ও চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করিতেছ এবং ভগবৎকৃপায় কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ পাইতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

আশীর্বাদ করি, সকর্ম ও নিষ্কর্ম সকল অবস্থাতেই তোমার মন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে লিপ্ত হউক।

কর্মফলদাতা ভগবান। তাঁর ইচ্ছায় কর্মের ফল মানুষ ভোগ করে এবং তিনি ইচ্ছা করিলে কর্মভোগ কম করিয়া দিতে পারেন, এমন কি, নাশ করিয়াও দিতে পারেন। আত্মজ্ঞান ও ভগবৎকৃপা ব্যতীত কর্মনাশ হয় না। কি কর্মসূত্র অবলম্বন করিয়া কর্মের কোন গাঁট খুলিবে তাহা কি মানুষ বুঝিতে পারে? সেইজন্য কর্মফলনাশ মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভর করে না। ভগবানের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অতএব ঐ সব বিষয়ে চিন্তা না করিয়া ঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া নিজ কর্তব্য করিয়া যাও। তিনি যাহা করিবার, যাহা তোমার কল্যাণজনক, তাহাই করিবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতাই ধর্মরাজ্যের প্রধান অবলম্বন। তাঁর কৃপায় উহা তোমার লাভ হউক—ইহাই প্রার্থনা।

মাঝে মাঝে ধ্যানজপের মধ্যে dull period (অবসাদ কাল) আসে। উহা আসিলেও জপধ্যান চালাইয়া যাইতে হয়। ঘা, ফোঁড়া প্রভৃতি শারীরিক অবস্থার জন্য হয়। প্রত্যেক বিষয়ের সহিত ধ্যানজপের একটা সম্বন্ধ আছে এরূপ চিন্তা করিও না। এসব অহঙ্কারের লক্ষণ। একটু ধ্যানজপ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাই একটা মস্ত কাজ করিতেছ এবং নিজে একটা কেউকেটা হইয়া পড়িয়াছ, এসব চিন্তা ঠাকুরের কৃপায় মনে যেন স্থান না পায়। খুব সাবধান। ইহা ধর্মরাজ্যের একটি প্রধান কণ্টক। উহাতে অনেকের পতন হইয়াছে।

Seminal discharge (স্বপ্নদোষ) পেট গরমের জন্য হইতে পারে। রাত্রে একটু ইসবগুল, একটু মিছরীর সহিত ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতে উঠিয়া খাইয়া লইবে। ইহাতে শরীর ঠাণ্ডা রাখে ও বাহ্যে পরিষ্কার হয়। অনেকের উহা ব্যবহারে উপকার হইয়াছে। তাহা ছাড়া শরীর দুর্বল থাকিলে যদি জোর করিয়া বেশী ধ্যান জপ করা হয় তাহা

হইলে দুর্বল শরীর গরম হইয়া reaction (প্রতিক্রিয়া) এরূপ হইতে পারে। যদি পার, একটু দুধ খাইবে।

ইহা ব্যতীত ধ্যান জপের আসন ইত্যাদি কতকগুলি নিয়ম আছে। ঐগুলি পালন না করিলে অনেক সময় এইরূপ হয়। ঐ সব নিয়মের মোটামুটি কিছু পালন করা ভাল। এই সম্বন্ধে স্বামিজীর 'রাজযোগ' পুস্তক পড়িও, বুঝিতে পারিবে। বয়সের দোষেও এসব হয়। যাহারা বালককাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে নাই তাহাদের পক্ষে ঐরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তুমি ঐসব লইয়া বেশী চিন্তা করিবে না। শরীরে যেরূপ সহ্য হয় সেরূপ ভাবে ঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া ধ্যান জপ করিয়া যাইবে। তাহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে। জপধ্যান বেশীক্ষণ একদিনে করা অপেক্ষা যাহাতে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ করিতে পার তদ্বিষয়ে লক্ষ্য বেশী দিবে।

আমার শরীর আজকাল মন্দ নয়। ঠাকুরের কৃপায় তোমার শরীর ও মন সুস্থ থাকুক এবং তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করুক—ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং আশ্রমের সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি—

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(১২)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

পোঃ খার, বোম্বাই

৭।১।২৭

প্রিয় ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। মঠে তোমাকে যে সব রূঢ় কথা বলিয়াছে তাহা অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম। তজ্জন্য

মনে কিছু করিও না। এক সঙ্গে থাকিতে হইলে মাঝে মাঝে কেহ কেহ বা এইরূপ বলিয়া ফেলে। তবে উহা যে অন্তর হইতে বলিয়াছে মনে হয় না। আর হইলেও তুমি তো আর কানা নও বা অন্ধ নও, উহা তো ব্যারাম। তাহা ছাড়া ভগবান লাভ করা বা না করা তো তাহাদের কথার উপর মোটেই নির্ভর করে না, বা কাহারও চেষ্টাচরিত্রের দ্বারা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর যাহার উপর প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিবেন এবং ভক্তিবিশ্বাস যাহাকে দিবেন তাহারই হইবে। তিনি যখন তোমায় আশ্রয় দিয়াছেন এবং আমরা যখন তোমার ভার লইয়াছি তখন তোমার কি হইবে না হইবে, সে আমরা বুঝিব। উহাতে তোমার বা অপরের কোন হাত নাই। ঠাকুর যখন তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তোমাকে যখন ভক্তিবিশ্বাস দিয়াছেন তখন তোমার ভগবান লাভ নিশ্চয়ই হইবে জানিবে। ঠাকুরের উপর ও আমাদের উপর বিশ্বাস ভক্তি রাখিয়া জীবন কাটাইয়া দাও এবং যখন যে অবস্থায় এবং যেখানেই থাক না কেন তোমার কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী জানিবে। তুমি ঠাকুরের ও আমাদের সন্তান। ইহা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিবে। যে যা বলে বলুক না কেন, কোন কিছুতেই দৃক্‌পাত করিবে না। আমরা আছি, সত্যস্বরূপ ঠাকুরও আছেন। তিনি তোমায় দেখিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিবে

শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং যেখানে থাক তথাকার কাজকর্ম সাধ্যমত করিয়া ধ্যান ও জপ খুব বাড়াও, তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই। প্রথম প্রথম মন তো বসে না। তখন জোর করিয়া বসাইতে হয়। তবে নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে নাই; উহাতে ক্ষতি হয়। ধ্যান ও জপ ধীরে ধীরে বাড়াইতে থাকিবে। ঠাকুরকে ও আমাদিগকে যতই আপনার বোধ হইবে ততই ধ্যান জপ আপনা আপনি বাড়িয়া যাইবে। তখন আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে না; না করিলেই বরং কষ্ট হইবে। তাঁর স্মরণ, মনন ও চিন্তা এবং আমাদের কথা ভাবা—এইভাবে দিন যাপন করাই

উদ্দেশ্য। কাজকর্ম করিলে ঠাকুর প্রীত হন ও আমরা প্রীত হই। এই জন্যই কাজকর্ম করা উচিত। এই বুদ্ধি থাকিলে আমাদের ও ঠাকুরের চিন্তা অহরহ হইতে থাকিবে। তাহাতে আমাদের সান্নিধ্য সদাসর্বদা অনুভব করিবে। এসবও আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপার উপর নির্ভর করে। যাহাতে সদাসর্বদা ঠাকুরের স্মরণ মনন হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। প্রাণ মন দিয়া করিলে নিশ্চয়ই তিনি প্রার্থনা পূরণ করিবেন। আশীর্বাদ করি, তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হউক।

ব্রহ্মচর্য্যের জন্য যখন সকলে তিন বৎসর নিয়ম করিয়াছে তখন উহার বিরুদ্ধে কাজ করা কি ঠিক? ব্রহ্মচর্য্য শুধু ceremony (অনুষ্ঠান) নয়। উহার প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করাই আসল ব্রহ্মচর্য্য। অতএব তুমি ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি পাঠ করিয়া সাধ্যমত উহা পালন করিতে থাক। ইহাই আমার ইচ্ছা। তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য লওয়াই হইল। তাহার পর সময়ে ceremony (অনুষ্ঠান) করিলেই হইবে।

তাহার পর অন্যান্য যেখানে ইচ্ছা তথায় থাকিতে চাও তা বেশ। আমি ত শীঘ্র মঠে ফিরিতেছি, এই মাসের শেষে। সেই সময় মঠে এসো। তোমার সহিত কথাবার্তা কহিয়া যাহা সুব্যবস্থা ও সুযুক্তিপূর্ণ হয় তাহাই করিব। যথায় থাকিলে তোমার শরীর মন ভাল থাকে তাহা প্রভুর ইচ্ছায় হইয়া যাইবে। ওখানে কাজ করিলে যদি চোখের বেশী strain (শ্রম) হয় তাহা হইলে চোখের কাজ কমাইয়া দিবে। চোখ খারাপ করিয়া লাভ নাই। শৈলানন্দকে আমার নাম করিয়া বলিবে।

প্রভুর কৃপায় শরীর একরূপ চলিয়া যাইতেছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং শৈলানন্দ, সুকুমার প্রভৃতি অন্যান্য সকলকে জানাইবে। ইতি

তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(১৩)

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শেঠ ভিলা
মধুপুর
১১।১০।২৭

শ্রীমান ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। শরীর যখন অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে তখন দিন কতক স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিলে যদি শরীর সুস্থ হয় তাহাই করা ভাল। কারণ শরীর ভাল না হইলে তাঁর কাজ কি করিয়া করিবে? তাঁর কাজের এখন অনেক বাকী। তোমাদেরই সে সব করিতে হইবে। তবে সত্রে খাইলে কি শরীর ভাল হইবে? চন্দ্র মহারাজকে বলে দেখ না?

তোমাকে গেরুয়া দিবার অনুমতি পূর্বে যখন দিয়াছি তখন আর কথা কি? তুমি গেরুয়া লইতে পার। আমি তোমায় আশীর্বাদ করিতেছি। গেরুয়া কাপড় ও কৌপিন ঠাকুরের এবং মার পদে স্পর্শ করিয়া লইবে। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একটু ভাল। মনে হয়, এখানে আমার স্বাস্থ্যের উপকার হইতে পারে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ বেলুড় মঠ
১০।৪।২৭

শ্রীমান ভুবন,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার শরীর এখন ভাল আছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। যথাসাধ্য ধ্যান জপ করিবার চেষ্টা

করিতেছ, তাহা খুবই ভাল। কিন্তু শারীরিক বেশী strain (শ্রম) না হয়। জীবনে সমাধি লাভ বা ভগবদ্দর্শন মানুষের চেষ্টায় হয় না। উহা সম্পূর্ণভাবে ঠাকুরের কৃপা-সাপেক্ষ এবং উহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আশীর্বাদে সকল সময় তাঁকে স্মরণ করিয়া যাইতে হইবে; এবং "হে প্রভু, আমার মঙ্গল কিসে হয় না হয় তাহা তুমিই জান" বলিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরের ভাব আনিতে হইবে। মুক্তি বা সমাধি ইত্যাদির জন্য ভগবানকে ডাকা ত ব্যবসাদারী হইল। সেইজন্য মুক্তি মুক্তি অপেক্ষা ভক্তরা ভক্তি ও বিশ্বাসই কামনা করেন। তোমার সেই ভক্তি বিশ্বাস অনুরাগ (স্বার্থশূন্য) ঠাকুরের কৃপায় বৃদ্ধিলাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

ধ্যানজপের সহিত সাধ্যমত কাজকর্ম করিতে ভুলিবে না। কাজও তাঁরই প্রীত্যর্থে আমরা করিয়া থাকি। হাতে কাজ এবং মনে প্রভুর স্মরণ—ইহাই হইতেছে ঠাকুর-স্বামিজীর শিক্ষা এবং আমারও মত। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। আমার শরীর একরূপ চলিয়া যাইতেছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

তোমার শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(১৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৫।১০।২৫

শ্রীমান ভুবন,

তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি আমার শুভ বিজয়ার শুভাশীর্বাদ জানিও। আমাদের আশীর্বাদ সততই তোমাদের উপর আছে। তোমাদের

খুব কল্যাণ হউক, সর্বদা এই ইচ্ছা করি। ঈশ্বরের কাজ, তাঁর কাজ—এই বুদ্ধিতে করিলে সব কাজেই তাঁকে মনে হইবে। তাহলেই ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জস্য হইবে। যে তাঁকে ভালবাসে, তাঁর চিন্তা করে সে তাঁর কাজে, তাঁর সেবায় কখনো বিমুখ হয় না। এইত সাধনভজন। ধ্যানজপে তাঁর চিন্তা এবং প্রত্যেক কাজে তাঁর সেবা-এইরূপে তন মন ধন দিয়া তাঁতে একেবারে নির্ভর করে, তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে পারলে কালে তাঁর কৃপা অনুভব করিতে পারিবে। ধর্মজীবনের হিসাব কয় বৎসর দীক্ষা হল ইত্যাদি calculation (গণনা) করলে কিছুই হবে না। প্রাণপণে সাধন ভজন কর। যম নিয়ম প্রাণায়ামাদি অল্প সল্প করিতে পার। তবে স্বামীজি 'রাজযোগে' যে **rhythmical breathing** এর বিষয় বলেছেন সেইটে করিতে পার এবং তাই করিও। তাঁর নাম করতে করতে ওসব হয়ে যায়। অত্রস্থ মঙ্গল। ইতি

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

বার

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধর্মপ্রসঙ্গ *

(১)

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে মে, রাত্রি আটটা, বলরাম মন্দির, কলিকাতা। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং ঢাকার ভক্ত শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত।

ললিতবাবু—মহারাজ, আপনি ঠাকুরের সন্তান। আপনাকে কি বলব, সেদিন চোখের সামনে যা দেখলাম, অতি আশ্চর্য ব্যাপার। ঠাকুরের ভক্ত মনোমোহন মিত্রকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তিনি বোধ হয় রামবাবুর মাসতুত ভাই হন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—হাঁ, সে রামবাবুর মাসতুত ভাই-ই হয়।

ললিতবাবু—তাঁর অতি আশ্চর্য বিশ্বাস, এমনটি বড় দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, তবু তিনি মেয়ের বিয়ের কোন চেষ্টা করছেন না। একদিন অনেকগুলি লোকের সামনে কোন ব্যক্তি তাঁকে মন্দ বলছিলেন। তাতে তাঁর মুখ খুব ভার হয়ে গেল এবং চোখ দুটো লাল হয়ে যেন জ্বলে উঠল। একটু দূরে দাঁড়ান একটি ছেলেকে দেখিয়ে তিনি বললেন, ঠাকুর আমাকে এমনি করে (হাত টান করে আঙুল দিয়ে) দেখিয়ে দিলেন, ওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে। তবু আমি কি মেয়ের বর খুঁজতে যাব? তাঁর এরূপ বিশ্বাস দেখে আর কেউ এ বিষয়ে কথা বললেন না। কি আশ্চর্য, কিছুদিন পর সেই ছেলেটির দাদা নিজে এসে তাঁর নিকট বললেন যে, তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

---

* ঢাকার ভক্ত ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক লিপিবদ্ধ।

মহারাজ, অনেকদিন থেকে ভেবেছি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। উদ্বোধন অফিসে প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর দেহত্যাগের আগে আপনি নাকি কি দেখেছিলেন ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—হাঁ, আমার ঐ রকম হয়। একদিন উপর থেকে দেখলাম, যেন খুব লম্বা চওড়া তুজন লোক নীচে পশ্চিম দিকের সিঁড়ির নিকট দাঁড়িয়ে আছে। তারা মানুষেরই মত, কিন্তু কি এক রকম ভীষণ চেহারা। একটু পরেই দেখি, তারা আর নেই। এরকন দেখে মনটা কেমন হয়ে গেল। ওদের জিজ্ঞেস করলুম, কেউ কখনও ওবাড়ীতে ভূতটুত দেখেছে কিনা। ওরা কিন্তু বললে, কেউ কখনও কিছু দেখেনি। ঐরকম আরও তুএকদিন দেখেছি। কোন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেননা এর আগে দেখেছি, ঐরকম বদ্ চেহারা দেখলে কোন না কোন অমঙ্গল হয়। তার পরেই প্রজ্ঞানন্দ দেহ রাখল।

এ বাড়ীতেও একবার ভূত দেখেছিলুম ঐ সিঁড়ির কাছে। তখন ভয় হল, এ বাড়ীর কোন অমঙ্গল হবে ; তাই একেবারে মঠে পালালুম। তার কিছুদিন পরেই শান্তিরাম বাবুর স্ত্রী প্লেগ রোগে মারা গেল।

ভক্ত— মহারাজ, ঢাকাতেও ত ভূত দেখেছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— হাঁ, ঐ বাড়ীটায়, যেখানে আমরা উঠেছিলাম। ওখানে যাওয়ার পরদিনই দেখি—এক ব্যাটা, মুসলমানের মত চেহারা, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, আবার দেখলে এ বাড়ী থেকে পালাব। কিন্তু ওকে আর একবারের বেশী দেখিনি। ওখানে অনেক রামনাম হতে লাগল, তাই বোধ হয় ভূতটা পালিয়ে গেল। ভূতপ্রেতরা ভগবানের নাম শুনতে পারে না।

ভক্ত—বোধ হয়, ঐ ভূতের টানেই সারদা বাবুর ছেলে আত্মহত্যা করেছিল। ছেলেটি বড় ভাল মানুষ ছিল, তার আত্মহত্যার আর কোন

কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। সে ছোকরা একটু দুর্বলচিত্ত ছিল। ভূতটা বোধ হয় তাকে আত্মহত্যার জন্য বারবার প্ররোচনা দিয়েছিল। তাই শেষে সে আর সামলাতে পারেনি। শুনেছি, এক বাড়ীতে একটি বউ কোন আমগাছের ডালে গলায় ফাঁসী দিয়ে মরেছিল। তার স্বামী দ্বিতীয় বার বিয়ে করলে পর সেই বউ ঘাটে যাবার পথে ঐ গাছটার দিকে চেয়ে থাকত। কিছুদিন ঐরূপ করবার পর সেও ঠিক একই ডাল থেকে গলায় ফাঁসী দিয়ে মরল। ভদ্রলোকটি তৃতীয় বার বিবাহ করলে তাঁর মা সর্বদা বৌটিকে চোখে চোখে রাখত, পাছে সেও আত্মহত্যা করে। কিন্তু সেও ঐ গাছের কাছে গিয়ে সেই ডালটির দিকে চেয়ে থাকত। শাশুড়ী জিজ্ঞেস করায় বললে, কে যেন ঐ ডালটার উপর থেকে তাকে সেখানে ফাঁসী দিতে ডাকছে। সে গাছটা কেটে ফেলার পর আর কোনও উপদ্রব হয়নি।

ললিতবাবু—আচ্ছা মহারাজ, আপনি আর কোনরূপ কিছু দেখেছেন কি ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ভাল মন্দ দুরকমই দেখেছি। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকবার সময় একজনের খুব অসুখ হয়েছিল। সেবা করবার লোক না থাকায় আমি কয়েকদিন তার সেবা করেছিলাম। একদিন রাত্রে তার কাছে বসে আছি। তার বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভাবলুম, কি আর করব, দেখি একটু জপ করে, এর যদি এতে যন্ত্রণা কমে। কিছুক্ষণ জপ করতেই যেন একটু তন্দ্রার মত এল। দেখলাম, একটি ১১।১২ বছরের মেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, উনি ভাল হবেন কি ? সে তখন ঘাড় হেঁট করে বললে, হাঁ। তার পরেই সে কোথায় চলে গেল। কি আশ্চর্য, তার পরদিনই ভদ্রলোকের জ্বরবিকার কমে যেতে লাগল।

বৃন্দাবনে যখন ছিলুম, তখন ভাল ভূত দেখেছিলুম। তখন হরি মহারাজও সেখানে ছিলেন। কালাবাবুর কুঞ্জে জায়গা ছিল না বলে

আমরা আর একটা বাড়ীতে আসন পেতেছিলুম। ঐ গলিটার নাম ছিল ভূতুড়ে গলি। হরি মহারাজ আমার পাশের ঘরে থাকতেন। তখন আমি রোজ রাত্রে বারটার সময় উঠে জপ করতুম। প্রায়ই দেখতুম, একজন বৈরাগী, কৌপীন বহির্বাস পরা, আমার পাশে দাঁড়িয়ে মালা জপ করছেন। রোজ তাঁকে দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, ভয় করত না। একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে একটু বেশী রাত্রে শুয়েছিলুম। খুব ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ যেন কে আমায় এত জোরে ধাক্কা মারলে যে, আমি দুই হাত দূরে সরে গেলাম। সেই বৈরাগী বললেন, 'ওঠ, বারটা বেজে গেছে। জপ করবে না?' তাঁর ধাক্কার চোটে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ভয়ে হরি মহারাজকে ডাকতে লাগলুম, 'হরি মহারাজ, জেগে আছেন? কত রাত হয়েছে?' তার একটু পরেই শুনি, রাত দুপুরের নহবত বাজছে। সেদিন এমনি করে ঘুম না ভাঙ্গালে আমার আর বারটায় ওঠা হত না। সেই সূক্ষ্মদেহীকে অনেক বার দেখেছি।

কাশীতেও একদিন ভাল ভূত দেখেছিলুম। সেবাশ্রমের হলঘরে রামনাম হচ্ছিল। তখন সবে রামনামের প্রথমে যে স্তবপাঠ হয়, তা আরম্ভ হয়েছে। দেখলাম, একটি বৃদ্ধ আস্তে আস্তে এসে হলঘরে যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি সাজান আছে, তার পাশে বসল। তাকে আর কখনও দেখিনি বলে আমি দুই তিন বার তার দিকে তাকালাম। একটু পরেই দেখি, সে আর নেই। তখন মনে হল, যেখানে রামনাম কীর্তন হয়, সেখানেই মহাবীর আসেন। তাই বুঝলাম, মহাবীর সেদিন বৃদ্ধবেশে এসেছিলেন। তুলসীদাস ঐরকম দেখেছিলেন।

ললিত বাবু—কি রকম দেখেছিলেন, মহারাজ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তুলসীদাস শৌচান্তে রোজ একটা গাছের গোড়ায় জল ঢেলে হাতমাটি করতেন ও বাকী জলটা ওখানে ঢেলে দিতেন। ঐ গাছে একটা প্রেত থাকত। সে তাতে তৃপ্ত হয়ে তাঁকে একদিন

বললে, 'তোমার উপর আমি খুব খুসী হয়েছি। তুমি কি চাও বল।' তুলসীদাস বললেন, "আমি আর কিছু চাই না। কিরূপে রামদর্শন হয়, বলে দাও।" তখন প্রেত বললে, "ও কাজ আমার সাধ্যাতীত। তবে, তোমায় উপায় বলে দিচ্ছি। ওমুক জায়গায় রামায়ণ পাঠ হয়। সেখানে মহাবীর পাঠ শুনতে যান। তুমি তাঁর শরণ লও। তিনি তোমাকে রামদর্শন করাতে পারেন।" তুলসীদাস বললেন, 'আমি তাঁকে চিনব কি করে?' প্রেত বললে, 'তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে সকলের আগে আসেন ও অমুক কোণে বসেন এবং সকলের শেষে উঠে যান।' প্রেতের পরামর্শে তুলসীদাস যথাস্থানে গিয়ে দেখলেন, একটি বৃদ্ধ এসে উল্লিখিত স্থানে বসলেন। তিনি যখন পাঠ শুনে চলে যাচ্ছিলেন; তখন তুলসীদাস পেছনে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমায় দয়া করে বলে দিন, কোথায় রামদর্শন পাব?' অনেক অনুনয়ের পর ছদ্মবেশী বৃদ্ধ কৃপা করে তুলসীকে বললেন, 'চিত্রকূট পর্বতে যাও। রামলীলা দেখতে পাবে।' তুলসী তখনই যাত্রা করে চিত্রকূট পর্বতে গেলেন ও বনের মধ্যে রাত্রে শুনতে পেলেন যেন দূরে গানবাজনা হচ্ছে। রাস্তায় দু-এক জনকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, 'ওখানে রামলীলা হচ্ছে। যাও দেখতে পাবে।' তুলসীদাস গিয়ে দেখলেন, রামলীলার গান হচ্ছে, এবং রামসীতা প্রভৃতি বসে আছেন। দেখে ফিরে এসে নীচের লোকদের ওকথা বলায় তারা বললে, 'তুমি কি ক্ষেপেছ? ওখানে বিজন অরণ্য, জনমানব নেই। রামলীলা কি করে হবে?' তখন তুলসীদাস বুঝলেন এবং এই বলে আপশোষ করলেন, 'প্রভু আমায় দেখা দিয়েও ফাঁকি দিলেন?'

ললিতবাবু ঢাকার ভক্তটিকে বললেন; "প্রফুল্ল, তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য যে, আজ মহারাজের মুখে এসব কথা শুনতে পেলাম।"

• বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে এপ্রিল রবিবার। ঢাকার ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষ্যে কয়েকদিন যাবৎ মঠে বাস করিতেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট বহু লোক আসেন বলিয়া তাঁকে নির্জনে পাওয়া কঠিন। আজ বৈকালে ঢাকার ভক্তটি মহারাজকে সাধনভজন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ঢাকার ভক্ত—মহারাজ, মন ত কিছুতেই স্থির হয় না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—প্রত্যহ কিছু কিছু জপধ্যান করবে, কোন দিনও উহা বাদ দিবে না। মন চঞ্চল বালকের মত কেবল পালাতে চায়; ওকে বারবার টেনে এনে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন করবে। এরকম দুই তিন বছর করলেই দেখবে, মন স্থির হয়ে যাবে এবং প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ আসবে। প্রথম প্রথম জপধ্যান নীরসই লাগে, কিন্তু ওষুধ খাওয়ার মত জোর করে মনটাকে ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত রাখতে হয়, তার পর ক্রমে আনন্দলাভ হয়। লোকে পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য কত খাটে; আর ভগবান লাভ তা অপেক্ষা অনেক সহজ। কেবল প্রশান্ত অন্তঃকরণে সরলভাবে তাঁকে ডাকতে হয়।

ঢাকার ভক্ত— একথা খুব আশাপ্রদ, মহারাজ। এমন কঠিন পরীক্ষায় যদি পাশ করতে পেরেছি, তবে চেষ্টা করলে ভগবান লাভ কেন করতে পারব না? এক এক বার কিন্তু অত্যন্ত নিরাশা আসে। মনে হয়, এত জপ করে যখন কিছুই অনুভব করতে পারছি না, তখন ভগবান্ লাভ অসম্ভব।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— না না, নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। কর্মের ফল অনিবার্য। হেলায় হোক আর ভক্তিভরেই হোক, ঈশ্বরের নাম করলে তার ফল হবেই হবে। খুব সাধনভজন করবে। কিছুকাল নিয়মিতরূপে এরকম সাধন ভজন করলে দেখবে, ক্রমে হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ আসবে।

ধ্যানাদিতে কেবল মনের শান্তি নয়, দেহেরও উন্নতি হয়, রোগাদি কমে যায়। অতএব, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।

ঢাকার ভক্ত— মহারাজ, মন্ত্র নেবার কি প্রয়োজন? নিজে নিজে যে কোনভাবে তাঁর চিন্তায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেই ত হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়ত তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগবে, পরশু বা নিরাকার ভাল লাগবে। এভাবে কোনটাতেই মন একাগ্র হবে না।

রবিবার ছুটি উপলক্ষ্যে মঠে বহু ভক্ত সমবেত হইলেন। সন্ধ্যার পর মঠবাড়ীর সম্মুখস্থ গঙ্গাতীরবর্তী দূর্বাদলশোভিত মাঠের উপর স্বামী ব্রহ্মানন্দ বসিয়া কলিকাতা হইতে সমাগত কয়েকটি ভক্তের সহিত কোন বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছেন। উক্ত স্কুলের ছাত্রীদিগকে বাড়ী হইতে আনিবার এবং বাড়ীতে দিয়া আসিবার সময় তিনি নিজে সঙ্গে যান এবং বলেন, অন্য কাহাকেও পাঠাতে বিশ্বাস হয় না। ভক্তটি গাড়ীর জন্য একটি ঘোড়া কিনেছেন এবং সহিসকে নিষেধ করেছেন ঘোড়াকে প্রহার করতে। একবার সহিসের চাবুকে ঘোড়ার গায় একটু রক্ত বেরিয়েছিল। তা দেখে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সর্বদা খিট্ খিট্ করেন বলে কোন সহিস বেশী দিন টেঁকে না। স্কুলে যে কয়জন অনুরাগী ও সদস্য ছিলেন, তাঁরা সব একে একে সরে পড়লেন। কমিটিতে এখন সব নারী সদস্য করেছেন। লোকে বলে, উনি সমস্ত বাড়ী শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান, আর পড়াবেন কখন?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— ওঁর mania (বাতিক) হয়েছে। নিজে সব কাজ করতে পেলে সমস্ত শক্তি বাজে কাজে ব্যয় হয়ে যায়, আর কাজের সময় মাথা ঠিক থাকে না। সেনাপতি যদি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে মাথা খাটিয়ে যুদ্ধের ব্যবস্থা করবে কখন? মাথা পায়ের কাজ করলে দুদিনও চলে না। আমি চিরকাল জানি, ইনি খেয়ালী লোক, ওঁর সঙ্গে একযোগে

কাজ করা অসম্ভব। আমিত তাই ঘেঁসি না। এখন বোধ হয়, ওঁর একটা নাম করবার ইচ্ছে হয়েছে। কর্মযোগ বড় কঠিন। ঠাণ্ডা মাথা, ত্যাগ বৈরাগ্য খুব দরকার। এসব না হলে ওতেই লোকে ডুবে মরে। সিদ্ধিলাভের পর প্রকৃত পক্ষে কর্মযোগের আসল অধিকার আসে। মেয়ে মানুষের সঙ্গে কাজ করা বড় কঠিন। ওরা ক্রমে ভুলিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তাইত ঠাকুর বলতেন, সোনার মেয়ে মানুষ হলেও তার সঙ্গে মিশতে নাই। এক গোলাপ মাকে নিয়েই আমরা অস্থির। শ্রীমার অসীম ধৈর্য, তাই তিনি সব সহ্য করতে পারেন। নচেৎ আর সব্বাই তাঁর ভয়ে অস্থির। একবার মা কোথায় যাবেন, সে গাড়ীতে তাঁর ভাইঝি প্রভৃতি যাবে। সর্বাগ্রে গোলাপ মা গিয়ে গাড়ী জুড়ে বসলেন। নিবেদিতার স্কুলটি কি রকম **smoothly** (সুচারুভাবে) চলছে।

পরবর্তী মঙ্গলবার ঠাকুরের পরম ভক্ত ৺বলরাম ঘোষের পুত্র রামকৃষ্ণ বাবু মঠে আসিলেন। তিনি সৌভাগ্যবশতঃ পৈতৃক ভক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন ও কিছু মৎস্যাদি মঠে আনিয়াছেন। রাত্রে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— রাম যত ব্যয় করে, সবই সৎকাজে লাগে, আর নিতাইর দানে কেবল অযথা ব্যয় হয়। এবার এখানে যে পূজা হল তাতে যাত্রা থিয়েটার, বাজী পোড়ান প্রভৃতির খরচ নিতাই দিয়েছে। ও না হওয়াই ভাল ছিল। সাধুর মঠে পূজা সাত্ত্বিকভাবে হওয়াই উচিত আর দরিদ্রসেবা।

স্বামী প্রেমানন্দ— ওকি আমি বলেছি ? শরৎ মহারাজ এবং শ্রীমাকে ধরে নিতাই সব করেছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— তুমি **allow** করলে (অনুমতি দিলে) কেন ?

স্বামী প্রেমানন্দ— তা আমি কি করব, মহারাজ ? সে শ্রীমা ও শরৎ

মহারাজকে রাজী করে তবে এসব এনেছে। তার কত উৎসাহ! বলে, এখানে মিনার্ভা থিয়েটার করব, যত টাকা লাগে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— তা হলেই চূড়ান্ত হত! ওটাই বাকী রয়েছে। দশ বৎসর পূর্বে কনখলে প্রতিমায় দুর্গাপূজার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই ঠাকুর এবার তা পূর্ণ করলেন। ওরা বলছিল, আগামী বৎসর মাদ্রাজেও এরকম দুর্গাপূজা করতে।

নাট্যাচার্য ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা অতুল বাবু মঠস্থ ব্রহ্মচারিদের সহিত হাস্যকৌতুক করিতে করিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের হংস-সর্পাদি লাঞ্ছিত প্রতীকের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিতেছেন : "ঐ যে হংস দেখছ, ঐটি পরমহংসদেব, আর সর্প টি শয়তান। এখন, সর্প টি রাত্রে হংসকে খেতে গেছে, ইতোমধ্যে সূর্য উঠে পড়েছেন। তখন সর্প ভাবছে, ফণা ধরে 'খাব কি না' " ইত্যাদি।

(৩)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৩০শে এপ্রিল, বৈকাল বেলা। কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ঢাকার ভক্ত প্রফুল্ল বাবু উপস্থিত।

ঢাকার ভক্ত— মহারাজ, আমি জপ ও ধ্যান এক সঙ্গে করতে আদিষ্ট হয়েছি। কিন্তু ধ্যান ত একেবারেই হয় না! এই জন্য মনটা মাঝে মাঝে বড় খারাপ হয়। কিরূপে ধ্যান জমে, অনুগ্রহ করে বলে দিন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ— দেখ, তুমি শ্রীমার মন্ত্রশিষ্য। একথা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা কর। কারণ, তিনি হয়ত এক রকম বলবেন, আর আমি অন্য রকম বলবো। তিনিত শীঘ্রই আসছেন। মনের এইরূপ depression (অবসাদ) আসা স্বাভাবিক। একবার দক্ষিণেশ্বরে আমার এইরূপ হয়েছিল। এসব কথা confidential (গোপনীয়)। জানবে আমার বয়স তখন কম, আর ঠাকুরের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কাজেই মনের সব কথা তাঁকে বলতে লজ্জা হত। একদিন কালীঘরে ধ্যান করছি, ধ্যান আদৌ

ওঃ, ঠাকুরের কি অলৌকিক শক্তিই না ছিল! তখন আমরা ভাবতুম, তাঁর কি এক শক্তি আছে, তার দ্বারা ওরূপ করে দিতে পারেন। এখন বুঝছি, এরূপ শক্তি কি অদ্ভুত। আমি একদিন বললাম, "মহাশয়, কাম টাম ত কিছুতেই যায় না, কি করি।" তখন তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে বিড় বিড় করে কি বললেন, তার পর আমার কামের ভাব একেবারে চলে গেল এবং ওটা আছে বলেই মনে হত না। দেখুন দেখি, কি অদ্ভুত ব্যাপার। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস এখনকার সময়ের এবং অবস্থার উপযোগী নয়। যোগসাধনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য প্রয়োজন, খাওয়া দাওয়া সাত্ত্বিক হওয়া চাই এবং সদ্‌গুরুর নিত্য সঙ্গ দরকার। প্রথম প্রথম ধ্যান মানে ত.মানসিক যুদ্ধ করা, ক্রমাগত পলায়মান মনকে টেনে এনে ইষ্টদেবের পাদপদ্মে সংযুক্ত রাখা। এতে একটু পরেই মাথা গরম হয়ে যায়। এজন্য প্রথম প্রথম খুব brain exert (মাথার পরিশ্রম) করতে নেই বা দম বন্ধ করে বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। যখন প্রকৃত ধ্যান হয় তখন দুই চার ঘণ্টা বসে থাকার পর ধ্যানভঙ্গ হলে মনটা খুব refreshed (প্রফুল্ল) হয়, আর শরীরও হাল্কা বোধ হয়। সুষুপ্তিতে দেহমনের যেমন আরাম হয়, ধ্যানে ততোধিক আরাম লাভ হয়। শরীরের সহিত মনের খুব নিকট সম্বন্ধ। পেট গরম হলে সেদিন কিছুতেই ধ্যান হবে না। তাই আহার সম্বন্ধে সাধকের এত নিয়মকানুন মানতে হয়। আধপেটা খাবে, পেটের সিকি অংশ জলে পূর্ণ করবে, আর বাকী সিকি অংশ বায়ু চলাচলের জন্য খালি রাখবে।

পাপ পাপ ভেবে মন খারাপ করবে না। লোকে যত বড় পাপই করুক না, লোকের চোখেই তা বড়। ভগবানের চোখে ও কিছুই নয়। তাঁর কৃপা-কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে যেতে পারে। সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং লোককে পাপ-পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য শাস্ত্রে অত সব গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের

কথা বলা হয়েছে। তবে কর্মফল অবশ্যই আছে। অন্যায় কাজ করলে মনে অশান্তি আসবেই। বৈষ্ণবদের 'ভজন' কথাটি বেশ। তাঁরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করেন। এতে সাধনের একঘেয়ে ভাব আসে না। কিন্তু সখীভাবে সাধন করবার জন্য মেয়েমানুষের মত কাপড় পরে থাকা প্রভৃতি করলে দেখা গেছে অনেকেরই পতন হয়।

(৫)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭শে মে। ব্রহ্মচারী যতীন্দ্রনাথ, পোষ্ট্যাল ইন্সপেক্টর যদুবাবু প্রভৃতি উপস্থিত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রামলাল দাদা ঠাকুরের এত সেবা করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। সংসারের ধাক্কাও তিনি কম খান না। বললেও শোনেন না। এক এক দিন আমি কি কম বলি!

ঠাকুরের কি সত্যনিষ্ঠাই ছিল। খেতে বসে যদি বলে ফেলেছেন, 'না', তবে আর সেদিন খাওয়া হত না। একদিন যদু মল্লিকের বাড়ীতে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু ভক্তের ভীড়ে ভুলে গেছেন। রাত্রে খাওয়ার পর সে কথা তাঁর মনে হয়েছে। তখন অনেক রাত্রি. কিন্তু যেতেই হবে। আমি লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে গেলুম। গিয়ে দেখি, গৃহদ্বার বন্ধ, সব ঘুমুচ্ছে। তখন বৈঠকখানার দরজা ফাঁক করে ভিতরে পা গলিয়ে ফিরে এলেন।

লোকের চেহারা দেখে তার মনটা যেন তিনি আয়নার ভেতর দিয়ে দেখতেন। কোন লোক এলে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখেই সব বুঝতেন এবং তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

বড় বড় মহাপুরুষদেরও অহঙ্কার যায় না। ভাস্করানন্দ স্বামী আমাকে নিজের ফটো দেখিয়ে বলেছিলেন, "দেখো, হামারা ফটো বিক্রী হোতা হায়।" আর ঠাকুর! কেশব সেন যখন পত্রিকায় ওঁর কথা লিখছিলেন,

তিনি তাকে ডেকে নিষেধ করে দিলেন। একদিন পেটের অসুখ হওয়ায় ঠাকুর নর্দমায় হেগে ফেলেছিলেন। দরওয়ান ব্যাটা নানারূপ গালিগালাজ করে ত্রৈলোক্য বাবুকে বলছিল শুনে আমার গা জ্বলে গেল। কি করি! ঠাকুর হাসছিলেন আর বলছিলেন, "কি হীনবুদ্ধি!" আমি কিন্তু রাগ সহ্য করতে না পেরে শাপ দিয়ে ফেললুম, "শালা, তিন মাসের মধ্যে রক্তামাশয়ে মরবি।" শেষে বাস্তবিকই আমার শাপ ফলে গেল।

এক বেশ্যার ছেলে গৃহস্থের মেয়ে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বউটা বেরিয়ে গেল এবং কিছুদিন পরে আবার ফিরে এল। একদিন ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন। মেয়েটি এসেই তাঁর পায়ে হাত দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর চমকে উঠলেন, যেন পায়ে আগুন লেগেছে। পরে তাকে বললেন, "তুমি যে সব করেছ, আমার নিকট বল। যদি তা না পার ত মা গঙ্গার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বল। তাহলেই তোমার সব দোষ কেটে যাবে।" মেয়েটার এমনি গ্রহ যে, তাও পারল না। তিনি যেমন জোরের সঙ্গে কথা বলতেন, 'কথামৃতে' তার এক আনাও প্রকাশ পায় নি।

(৬)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাসের মধ্য ভাগ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রাতঃকালে ধ্যানাদির পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। তিনি প্রায়ই নির্জনে আপনার ভাবে একা থাকিতে ভালবাসেন। কলিকাতা অথবা অন্যান্য স্থান হইতে লোকজন আসিয়া অনেক সময় দেশ-কালোপযোগী নানা কথার অবতারণা করেন। সকলের ভাব সমান নয়। এরূপ সভায় উপস্থিত কোন কোন ভক্ত স্বীয় ভাবের বিরুদ্ধ কথায় কখন কখন কিঞ্চিৎ ব্যথিত হন। তাঁহারা হয়ত সংসার-তাপে তপ্ত হইয়া আশ্বস্ত হইতে আসিয়াছেন। আশা, ঠাকুরের মানস পুত্র ব্রহ্মানন্দময় মহাপুরুষের

শ্রীমুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিয়া প্রাণে শান্তি লাভ করিবেন। কোন কোন ভক্তের এরূপ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন—

"ওরে, যার যা জিজ্ঞাস্য আছে বল্। নইলে বল্‌বে, 'সাধুর কাছে গিয়ে শুধু বাজে কথা শুনে এলুম।'"

ভক্ত—মহারাজ, ভগবানে মতিগতি কিরূপে হয়?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—সাধুসঙ্গে। সাধুরা কি করেন তা লক্ষ্য রাখা আর তদনুরূপ জীবন যাপন করা দরকার। প্রশ্ন দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন হয় না, শুধু শুনলে কিছু হয় না। ব্রহ্মচর্য পালন এবং সাধনভজন না করলে শাস্ত্রের বা গুরুর উপদেশ ধারণা করতে পারবে না। শুধু শাস্ত্রপাঠ করলেও অর্থবোধ হবে না, সাধন না থাকলে। 'কথামৃত' প্রভৃতি বই পড়বে ও তা ধারণা করতে চেষ্টা করবে। যত বার বার পড়বে, ততই ওর নূতন নূতন অর্থ পাবে। সাধক ভগবান সম্বন্ধে শুনে এক রকম বোঝে, সাধন করে অন্য রকম বোঝে। আবার সিদ্ধ হয়ে আর এক রকম বোঝে।

নাগ মহাশয় একটি অতি সুন্দর কথা বলতেন, নোঙ্গর ফেলে দাঁড় টানলে কি হবে? এমন দুর্লভ মানুষ-জন্ম পেয়ে ভগবান লাভের চেষ্টা না করলে বৃথাই জীবন। শঙ্করাচার্য বলেন, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়—এই তিনটি অতি দুর্লভ। যারা ভাগ্যবান্, তাদের এসব লাভ হয়। নাগ মহাশয় আর একটি কথা বলতেন, "প্রতিষ্ঠা লাভ করা সহজ, কিন্তু ত্যাগ করাই কঠিন। যে ওটা ত্যাগ করতে পারে, সেই প্রকৃত সাধু।"

ভক্ত—মহারাজ, কামজয় হয় কি করে?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তাঁর নাম জপ ও স্মরণ মনন করলে হয়। বুঝতে পারলে ত?

ভক্ত—কাম ত কিছুতেই জয় করতে পারলুম না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তবে বিয়ে কর, আর উপায় কি। সর্বদা বিচার

করবে, লোকে কত কি পারে, আমি কেন কামজয় করতে পারব না; আমাকে পারতেই হবে। তোমার যে ভাব ভাল লাগে, সেভাবে ভগবানকে ডাক। ধ্যানজপ বা গান করা—যা ভাল লাগে তাই কর। সন্দিগ্ধ বুদ্ধি করো না।

ভক্ত—ঠাকুর ভক্তদের বলতেন, "নির্জনে গোপনে ভগবানকে ডেকে ডেকে কাঁদবে। তা এক বৎসর, কি তিন মাস, কি তিন দিন হোক।" সাধুসঙ্গ ও নির্জন সাধনের উপর আমাদের বেশী জোর দেওয়া উচিত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—নির্জনে ধ্যান করতে বসলে মন সহজে অন্তর্মুখী হয়, এতে বাজে চিন্তা কম আসে। কিন্তু সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার। সাধন পথে একটু না এগোলে নির্জন বাস ভাল লাগে না। কেউ কেউ একেবারে নিঃসঙ্গ হতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। তবে মন সমাধিস্থ, ভগবানে লীন না হলে ঠিক ঠিক নিঃসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গের একটি ফল তাঁদের চরিত্র দর্শন। এতে মন যতটা impressed (প্রভাবিত) হয়, ততটা শত বই পড়লেও হয় না। অধর সেন প্রায়ই ঠাকুরের কাছে তাঁর এক বন্ধু স্কুল সাবইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। সেই ভদ্রলোকের প্রায়ই ভাব হত। একদিন ওরা আসার একটু পরেই ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। তখন তাঁর মুখখানি ফুলের মত বিকশিত, যেন ভিতরে আনন্দ ধরে না। তখন অধর বাবু তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, "তোমাদের ভাব দেখে ভাবের উপর আমার ঘৃণা হয়ে গিয়েছিল। কেন না, তোমাদিগকে ভাবস্থ দেখলে মনে হত, যেন ভিতরে কত যাতনা। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা হতে পারে? কিন্তু ঠাকুরের আনন্দপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখে আমার চোখ ফুটল। এঁর ভাব তোমাদের মত দেখলে এখানে আর আসতাম না।" আর একটি লোক ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট হতে ফিরে ভাবছে, ইনি কথা বলেন না, এঁর কাছে গিয়ে আর কি লাভ? এর পর আর একদিন সেই লোকটি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে গিয়ে একটু বসবার পর স্বামিজী

অত্যন্ত আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন, কতক্ষণ পরে আবার খুব হাসলেন। এ দেখে লোকটি ভাবলে, "আহা আজ যা শিখলাম, সহস্র পুস্তক পাঠেও তা হত না। ভগবানের জন্য যখন এমন ব্যাকুল হব, তখনই তাঁর দেখা পাব। আবার তাঁর কৃপা লাভ করলে এমনই আনন্দ পাওয়া যায়।"

ভক্ত—মহারাজ, আপনি সেদিন বলেছিলেন যে হাঁক পাঁকে কিছু লাভ হয় না, সময় না হলে কিছুতেই কিছু হবে না। তবে ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা ছেড়ে দিতে হবে কি?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ও হয়ত অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলাম। হাঁকপাঁকানি মানে দুই একদিন ভাবের ঘরে খুব ছট্‌ফটানি, কান্নাকাটি, ভিতরের ভাবের ক্ষণিক বহির্বিকাশ। ও দুদিন পরেই লোপ পায়। তখন সে নৈরাশ্যে ও অবসাদে ওদিক একেবারে ছেড়ে দেয়। যেমন আমাদের গ—। ও খুব সাধনভজন করেছে, কিন্তু এখন আবার তার ঝোঁক হয়েছে, ব্যাকরণ পড়ে পণ্ডিত হবে। দুটো শ্লোক ঝেড়ে লোকমান্য পাবার ইচ্ছে জেগেছে বোধ হয়।

ভক্ত—ঠাকুর যেমন বলেছেন, একবার এখানে, আবার ওখানে কুঁয়ো খুঁড়তে গেলে কোথাও জল পাওয়া যায় না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—হাঁ ঠিক সেই রকম। একটিতে লেগে থাকতে হবে। ঠিক ঠিক অনুরাগ থেকে যদি কারুর ভগবান লাভের জন্য হাঁকপাঁকানি আসে, তবে তাতে ইষ্টলাভ না হলেও সে তাঁকে ভুলে থাকতে পারে না। কোটি জন্ম না পেলেও অচল অটল ভাবে সে ডাকতে থাকে। স্বামিজী বলতেন, কুলকুণ্ডলিনী একটু জাগা বড় ভয়ানক; ও উপরে না উঠলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি নীচ বৃত্তিগুলি প্রবল হয়। এজন্য বৈষ্ণবদের মধুর ভাবে, সখীভাবে সাধন বড় dangerous (বিপজ্জনক)। রাতদিন শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা স্মরণ করতে গিয়ে কাম চেপে রাখতে পারে না।

নানারূপ ব্যভিচার করে। আমি একজনকে জানি, সে দীর্ঘকাল ঐরূপ সাধনের পর একটা বদ্‌খত মাগীকে বিয়ে করলে। সেই জন্য সাধনের প্রথম অবস্থায় রাসলীলা বিষয়ক বই পড়তে নাই।

ধ্যান করা কি সোজা কথা। একটু বেশী খেলে ত সেদিন আর মন বসল না। এরূপে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি সবগুলি রিপুকে চেপেচুপে রাখতে পারলে তবে ধ্যান সম্ভব হয়। যে কোন একটা রিপু জোর করলে ধ্যান হবে না। দু পয়সার ঘুঁটে কিনে জ্বালিয়ে তার ভিতরে বসা ত খুব সোজা। কামক্রোধাদি রিপুগুলি ও কামনাকে দমন করে রাখা এবং ওদের expression (প্রকাশ) হতে না দেওয়াই আসল তপস্যা। নপুংসকের কি ধর্ম হয়? কামাদি রিপু ও বাসনাদি দমনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। তবে সংসারী লোকে কত কি পাপ করে। তোমাদের মনে দু একটা খারাপ ভাব উঠলে তাতে দোষ নেই। মন থেকে সেগুলো ঠেলে ফেলে দেবে।

(৭)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা জুন রবিবার। আজ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। মঠে সাধারণতঃ অন্য দিন অপেক্ষা রবিবার বেশী ভক্ত-সমাগম হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে থাকিলে ভক্ত সমাগম বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৈকাল বেলা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন।

ভক্ত—মহারাজ, ব্যাকুলতা কিসে হয়?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—সৎসঙ্গে ও গুরুর উপদেশ পালনে মন শুদ্ধ হয়। সাধন ভজন করতে করতে ব্যাকুলতা আসে। সংসারে এমন কি চুরি করতে পর্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এত বড় ব্রহ্মবিদ্যার জন্য গুরুর দরকার নেই?

অন্যান্য কথাবার্তার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবার বলিলেন, "সাধুর কাছে এলে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয়। তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা কর।"

ভক্ত—কিসে শান্তি পাওয়া যায়?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ভগবানে প্রেম হলেই শান্তি আসে; আর ভগবানে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হলেও শান্তি লাভ হয় প্রথমেই কি শান্তি আসে? প্রথমে অশান্তি, ব্যাকুলতা ও ভগবানকে পাচ্ছি না বলে যন্ত্রণা। যত পিপাসা বাড়ে তত জল মিষ্টি লাগে। অশান্তি খুঁচিয়ে তুলতে হয়। লোকে যখন সংসার-ভোগে আর সুখ পায় না তখন অশান্তি আসে, আর তাঁর উপর টান হয়।

ভক্ত—প্রেম কিসে হয়?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—সাধন ভজন এবং প্রার্থনা দ্বারা প্রেম লাভ হয়।

ভক্ত—সংসারে থেকে হয় কি না?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—সংসারের বাইরে কেউ আছে?

ভক্ত—না। আমি বলছি, পরিবারের মধ্যে থেকে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তাই বলুন। নিশ্চয়ই হয়, তবে কষ্টে।

ভক্ত—সংসারে বৈরাগ্য হলে কেউ বেরুতে পারে কি না?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—হাঁ উচিত। তার নামই বৈরাগ্য। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য একবার হলে আর চিন্তা নাই। আগুন জ্বললে আর নিভে না, বরং উত্তরোত্তর বাড়ে। ঠাকুর উপমা দিতেন, "পুকুরের মাছ যেমন বাইরে গেলে প্রাণ পায়, তেমনি সংসার থেকে মানুষ বাইরে এলে আর কি ফিরতে চায়?"

ভক্ত—গুরু ছাড়া কি হয় না?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—আমার বোধ হয়, না, কিছুতেই হয় না। গুরু মানে যিনি ইষ্টলাভের পথ বলে দেন, ভগবানের কোন নির্দিষ্ট নাম জপ করতে বলেন। উপগুরু অনেক হতে পারে, কিন্তু মন্ত্রগুরু এক। সদ্‌গুরু বলে

দেন, এই এই সাধন কর, আর সৎসঙ্গ কর। পূর্বে নিয়ম ছিল, গুরুগৃহে বাস—গুরু শিষ্যকে watch (লক্ষ্য) করবেন। শিষ্যও গুরুর সেবা করত। শিষ্য বিপথে গেলে গুরু তাকে ফিরিয়ে আনতেন। সেজন্য ব্রহ্মবিদ্ বা উন্নত সাধক ভিন্ন গুরু করতে নাই।

ভক্ত—গুরু কি করে চিনব?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই শিষ্য গুরুকে চিনতে পারে। গুরুও শিষ্যকে দেখবেন। যার মনে বিষয়-বাসনা খুব প্রবল, সদ্‌গুরু তাকে মন্ত্র দেন না। কারণ, তার মনকে ফিরিয়ে আনা খুব শক্ত। যাকে গুরু পছন্দ করবেন, তার কাছে কাছে থাকবেন, আর watch (লক্ষ্য) করবেন। কুলগুরুর এক মস্ত বড় advantage (সুবিধা) এই যে, সে বংশের সব খবর রাখে। মন একাগ্র করবার উপায় সাধন ভজন, ধ্যান ধারণা। প্রাণায়ামও একটী উপায়, তবে সংসারীর পক্ষে উহা saf (নিরাপদ) নয়। বীর্যস্খলন বেশী হলে নানা ব্যারাম হয়। পুষ্টিকর আহার, উত্তম স্থান, বিশুদ্ধ বায়ু, এসব চাই প্রাণায়ামে। আর ধ্যান-ধারণায় কোন conoition (সর্ত) নাই। ধ্যানে concentration (একাগ্রতা) এর জন্য নির্জনে অভ্যাস করতে হয়। একদিন এক ঘণ্টা নয়, যত করবে, তত হবে! যেখানে যাবে, ভাল স্থান, সুন্দর scenery (দৃশ্য) দেখলেই ধ্যানে বসে যাবে। সর্বত্র তাঁকেই খোঁজ। কামকাঞ্চন ত্যাগও করতে হবে। আগে ভিতরে ত্যাগ দরকার। এই জগৎ অনিত্য। এ থেকে মন আগে তুলে নেবে। তিনি সাকার, আবার নিরাকার, এবং তার ওপার। বেদান্তের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা। সমাধিতে জগৎ থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থার পরে মনে হয়, নিদ্রায় বেশ সুখে ছিলাম। সমাধির পরেও তেমনি মনে হয়। সমাধি থেকে নেমে ঋষিরা সদানন্দে থাকতেন। সমাধিতে যা অনুভূত হয়, তা মুখে বলা যায় না। তখন 'আমি' 'তুমি' থাকে না, কেবল সচ্চিদানন্দ।

যদি বল, "ঈশ্বর আছেন, প্রমাণ কি ?" উত্তর এই, "সাধুরা বলেছেন এবং আমরা পেয়েছি এবং তোমরাও পাবে। শাস্ত্রেও আছে " ঠাকুর বলতেন, "সিদ্ধি সিদ্ধি বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি আন, ঘোঁট, খাও। তারপর একটু অপেক্ষা কর, তবে ত নেশা হবে ?" তেমনি শুধু ভগবান্ ভগবান্ বললে হবে না। সাধন কর, তারপর একটু অপেক্ষা কর।

ভক্ত—জপ করতে করতে সব ভুল হয়ে যায়। ওটা কি ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পতঞ্জলি বলছেন, ওটা বিঘ্ন। ধ্যান মানে তাঁকে ভাবা। ধ্যান পাকলে সমাধি হয়। সমাধিতে ইষ্টদর্শন হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হয়। সমাধির পর আনন্দের জের অনেকক্ষণ থাকে। কেউ কেউ বলে চিরকাল থাকে। শুনেছ ত, সুন্দরবনের সমাধিস্থ সাধুকে এনে তাঁর জিভ টেনে সমাধি ভাঙ্গলে ও খেতে দিলে পর তিনি পেটের অসুখে মরলেন। হঠযোগে মন স্থির হয়, আর খাওয়া দাওয়ার ঝঞ্ঝাট থাকে না, ভগবান লাভের সুবিধা হয়।

চৈতন্যদেব একজন শিষ্যকে রায় রামানন্দের কাছে পাঠালেন। রামানন্দ বিলাসী, কিন্তু ঈশ্বরের নামে তাঁর হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা উঠে। কথায় বলে, সাধু না হলে সাধু চিনতে পারে না, বা হীরের দাম বেগুন-ওয়ালা জানে না। একজন সাধন করে উচ্চাবস্থা পেলে সে নিজে নিশ্চয়ই বুঝতে পারে। ধ্যানের সময় ভাববে, এসব ভাবনা কিছু না, অসৎ। ক্রমে impression (সংস্কার) পড়বে। এগুলি যেমন তাড়াবে, তেমনি ভাল ভাব আনবে। ধ্যান করতে করতে জ্যোতিঃদর্শন হলে বা শব্দ টব্দ শুনলে বুঝবে, মন ঠিক পথে যাচ্ছে। কিন্তু এসবও কিছু নয়, তবে এ সব লক্ষণ ভাল। নীরব স্থানে ধ্যান করতে করতে অনাহত প্রণবনাদ বা ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, কখন কখন বহু দূরের শব্দও শোনা যায়। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মজ্ঞানের পর বলছেন, "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী"। এ সব বলেছেন লোকশিক্ষার জন্য। তিনি বলছেন যে, সব উপায়েই ভগবান লাভ

হয়। একটা লোক খুব ডানপিটে ছিল। সে মৃত্যুর পনের দিন পূর্বে বলছে, "চল চল, আমায় গঙ্গায় নিয়ে চল। তোরা বুঝি ভেবেছিস, আমি এখানে মরব?" সে গঙ্গায় গিয়ে একটু হাসলে ও বললে, "মা তুই ছিলি বলে এত পাপ করেছি। জানি, তুই সব ধুয়ে মুছে ফেলবি"। ভক্তি বা বিশ্বাস একটা থাকলেই ভগবান লাভ হয় মানুষ মুক্ত হয়।

(৮)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৮ই মে। ঢাকার ভক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার ও প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় রামলাল চট্টোপাধ্যায়, পোষ্ট্যাল ইন্সপেক্টর প্রভৃতি উপস্থিত। প্রাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামলাল দাদা ও ভক্তগণের সহিত মঠবাড়ীর দোতলায় বারান্দায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন।

রামলাল দাদা—একবার পাঁচ সাত জন ভক্ত ঘাড়ে করে জিনিষপত্র নিয়ে এসে কামারপুকুরে প্রসাদ পেলেন। কিন্তু ৺রঘুবীরকে একটুও না দিয়ে সব জিনিষ নিয়ে জয়রামবাটীতে চলে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরেও মাঝে মাঝে বহু ভক্ত প্রসাদ পেতে যান—কারুর সঙ্গে আধ সের চাল, কারুর সঙ্গে দুটো কলা থাকে। কেউ কিছু দিক আর নাই দিক, আমরা ত আর কাউকে অযত্ন করতে পারি না। সেদিন বেলঘরের তারক এসেছিল, সে এখন শিয়ালদহে কাজ করে। সে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেছে। তার অনেক ছেলেপুলে হয়েছে, বড় বিব্রত। আর সে চেহারা নাই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—আগে তার কেমন মনটি ছিল। কিন্তু এখন! ঠাকুর বেছে বেছে লোক জোগাড় করেছিলেন। নিত্যগোপালের এত উচ্চাবস্থা হয়েছিল, কিন্তু ঠাকুর বলতেন, "যদি এমন, তবে মাজার কাপড় খসে না কেন?" পরে যখন শুনলেন, তিনি দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছেন, তখন বললেন, "দেখলি, এইজন্য এমন। যে শালা আগুপাছু ভেবে কাজ করবে, সে শালা পড়ে যাবে।"

জনৈক ভক্ত—মহারাজ, কিছু বোঝা যায় না। নিত্যগোপাল, বেলঘরের তারক প্রভৃতি এমন লোক ঠাকুরের কৃপা পেয়েও বিগড়ে গেল কেন? অনেকের বিশ্বাস, ঠাকুরকে দর্শন করলে আর ভাবনা নেই, সাধনভজনেরও দরকার নেই। রাম বাবুরও ত সেই মতই ছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তাঁর কথা আলাদা। তাঁর তেমন বিশ্বাসও ছিল। আর শেষ পর্যন্ত সে ভাব ঠিক রেখে সব ছেড়ে দিলেন। অপর লোক শুধু মুখে বলে, কিন্তু বিশ্বাস নেই।

ভক্ত—অনেকের বিশ্বাস, শ্রীমাকে দেখেছি, আমাদের আর ভাবনা কি?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—আর ভক্তিভরে শুধু সাধুসেবা করলেও হয়। ধ্যান ধারণা, বিবেক বৈরাগ্য, এসব খুব দরকার। এই আশু মিত্র বলে একটা ছোঁড়া উদ্বোধনে ছিল। তার নাই ধ্যান, নাই কিছু; সর্বদা কেবল মার কাছে কাছে থাকত। কি সেবা! মার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের দুধ পর্যন্ত খাইয়ে দিত। শেষে আমাদের পর্যন্ত গ্রাহ্য করত না। শরৎ মহারাজকে একদিন সে বলেছিল, মার টাকা পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিতে। তখন শরৎ মহারাজ বললেন, "তোকে কেন দিতে যাব? হয় মাকে দিব, না হয় মহারাজকে।" তখন মাও তাকে ভিন্ন জানতেন না। শেষে সে এমন গর্হিত কাজ করলে যে, মাই তাকে দূর করে দিতে বললেন। শালা এমন করেছিল যে, তা মুখে আনলেও পাপ হয়। তুমি তা শুনেছ?

ভক্ত—আজ্ঞে না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ও শুনে আর কাজ নেই।

রামলাল দাদা—তা হলে কামারপুকুরে আমি যাব, না শিবুকে পাঠাব?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—কে জানে দাদা! বাবুরামকে ওসব জিজ্ঞেস কর। ওসব পরামর্শ এখন আর আমার আসে না, সব গুলিয়ে গেছে। আমরা

সাধুলোক। আমাদের নিকট ব্রহ্ম সত্য, আর জগৎ মিথ্যা। চিরকাল জগৎটাকে মিথ্যা ভেবে এখন আর ওসব বিষয়ে পরামর্শ আসে না। ব্রহ্মকেও পেলুম না, জগৎটাকেও ঠিক ঠিক মিথ্যা বোধ হল না।

রামলাল দাদা—আপনারাও যদি এরূপ বলেন, তবে আমরা আর যাই কোথা?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—মন খারাপ হয়ে গেছে। একা একাই থাকি ভাল। নীচে গিয়ে কারুর সঙ্গে মনও মেলে না। আর লোকজনও ভাল লাগে না। তাই কাশী টাশী অঞ্চলে থাকি। যাদের সঙ্গে মনের মিল হত, তারা সব একে একে চলে যাচ্ছে। ঐ শশীর কাছে ওবার ছয় মাস ছিলুম। কি সুখেই দিন কেটেছে তখন! তার মত ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক এমন আর কেউ নিতে পারে নি। দক্ষিণে আমার ভ্রমণের জন্য এক হাজার টাকা খরচ করলে, ট্রেণে আমাকে first classএ (প্রথম শ্রেণীতে) নিয়ে গেল। মুখে প্রতিবাদ করলুম, কিন্তু মনে মনে খুব খুসী হলুম। সাধুর এমনি হওয়া চাই, টাকাকে পয়সার মত দেখবে, টাকায় টান থাকবে না। আর একটি ছিল যোগেন। এখন এক হরি মহারাজের কাছে থেকে সুখ হয়। সেও বাঁচবে না, যে কঠিন রোগে তাকে ধরেছে। ছেলেবেলা থেকে তার অটুট ব্রহ্মচর্য ছিল, আর health (স্বাস্থ্য) ও ভাল ছিল, তাই এখনও টিঁকে আছেন।

রামলাল দাদা—আর,—মহারাজ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তার কথা ছেড়ে দাও। ছোটবেলা দেখনি, ঠাকুরকে ছেড়ে দিয়ে অমুকের সঙ্গে জুটেছিল।

ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম। হেসে হেসে পেটে ব্যথা হয়ে যেত। এখন ধ্যান ধারণা করে যা না হয়, তখন তাঁর কাছে এমনিই তা হত। যদি কখনও এক আধটুকু মন খারাপ হত, তিনি মুখ দেখেই টের পেতেন, আর বুকে হাত দিয়ে মন ঠিক করে দিতেন। তাঁর কাছে কত আবদারই

না করতুম। একদিন পশ্চিমের গোল বারান্দায় তাঁকে তেল মাখাতে কি একটু হয়েছিল। আমি রেগে শিশি ফেলে দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেলাম, তাঁর কাছে আর থাকব না বলে। কিন্তু যদু মল্লিকের বাগানের কাছে গিয়ে আর চলতে পারলুম না, বসে পড়লুম। এদিকে তিনি রামলালদাকে পাঠিয়েছেন আমাকে ডাকতে। আমি ফিরে এলে বললেন, "দেখলি, যেতে পারলি ? গণ্ডী দিয়ে রেখেছিলুম।"

একদিন একটা ভয়ানক কুকর্ম করে ফেলেছিলুম। পরদিন তজ্জন্য ভয়ানক অনুতাপ হল। ফিরে তার কাছে গেলুম বলতে। যেতেই বললেন, "গাড়ু নিয়ে চল বাহ্যে যাব।" ফিরবার সময় বললেন, "তুই কাল রাতে অমুক কাজ করেছিস আর অমন করিস নি।" আমি ত শুনে অবাক! কি করে জানলেন! আর একদিন কলকাতা থেকে এসেছি। বললেন, "কিরে, তোর দিকে কেন চাইতে পারছি না ? কিছু অন্যায় করেছিস ?" আমরা জানতুম, চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রী হরণ করলেই কুকাজ করা হয়। বললুম, "না"। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কি কিছু মিছে কথা বলেছিস ?" তখন মনে হল, একটা মিছে কথা বলেছিলুম।

ভক্ত—মহারাজ, ধ্যান ধারণা করে ত কিছুই হয় না দেখছি। আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি, দয়া করে কিছু করে দিন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তুমিও যেমন! 'পেটের ছেলে করলেন খুব, বাকী রয়েছে নাতি।' আমাদেরই খুব হল, আবার তোমাদের দেব!

ভক্ত—যাই বলুন, দীনবন্ধু * স্বপ্ন দেখেছিল, ঠাকুর বলছেন, তিনি এখন আপনার দেহে বর্তমান।

স্বামী প্রেমানন্দের কথোপকথন *

(১)

বেলুড় মঠ। ১৯১২ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর, রাত্রি আটটা। স্বামী ধীরানন্দ, কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত। গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসিয়া স্বামী প্রেমানন্দ মঠস্থ সাধু-ব্রহ্মচারীদিগের সহিত কথা বলিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধর্মের প্রেরণায় ভারতের নানা স্থানে শিবজ্ঞানে জীবসেবার্থ আশ্রমাদি স্থাপিত হইতেছে। তথায় তরুণ ত্যাগীরা মেথর হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সর্বজাতীয় দুঃস্থ নরনারীর সেবায় নিযুক্ত। দেশের পনের-আনা লোকই দরিদ্র। তদুপরি দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপদ লাগিয়াই আছে। তাই মিশনের কার্য প্রসারের সহিত স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজনও বাড়িতেছে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বৈরাগ্যবান্ সেবক আবশ্যকীয় সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ সত্ত্বগুণজাত কর্মত্যাগের ছলে তমোপ্রসূত আলস্যের প্রশ্রয় দিতেছেন। তাই স্বামী প্রেমানন্দ বলিতেছেন—

"আজকাল ছেলেদের এক হুজুগ হয়েছে কর্মত্যাগ। যেন সব শুকদেব হয়ে বসেছেন। এসব 'কথামৃত' পাঠের ফল। ঠাকুরের উপদেশ লোক বিশেষের উপর ছিল। যখন যার সঙ্গে কথা বলতেন সে সব কথা অনেক সময় একমাত্র তাঁর সম্বন্ধেই খাটত। যেমন, তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন, দেখ, বিয়ে করবি ত একটা বোঁচা কাল মেয়ে বিয়ে করবি। তা হলে তুই তাকে যা বলবি সে তাই শুনবে।' আর অভেদানন্দকে

বলতেন 'তুই খুব সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করবি। তা হলে তোতে তার মন উঠবে না। তখন সে নষ্টা হবে ও তোকে ছেড়ে যাবে '

"আহা! বরাহনগর মঠে আমাদের সকলের কি ব্যাকুলতাই না ছিল! তখন যে পাক হয়েছিল, তার ফল স্বামিজী। এখানকার শিক্ষাই ত্যাগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি। ঠাকুর একজনের কাছে তেলধুতি চেয়েছিলেন। সে ভাল কাপড় আনায় তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। আর এখানে এখন যারা আসছে, তাদের কেউ কেউ ভাল কাপড় ধুতি চাদর চায়। নানা বাসনা নিয়ে আসে—মোহন্তগিরি, আমেরিকায় লেকচার, নামযশ প্রভৃতি। ছি ছি! আমেরিকায় আমাদের মঠ আছে—এসবের অহঙ্কার করে। এতে তোর কি? অনৈশ্বর্য্যই সাধুত্ব। ঠাকুরের সঙ্গে বুদ্ধাদির তুলনা? যাকে না দেখেছি, সে বড় সুন্দরী; যার হাতে না খেয়েছি, সে বড় রাঁধুনী। গুপ্তকে (সদানন্দ স্বামীকে) স্বামিজী এত ভালবাসতেন কেন? স্বামিজীর যখন ঐশ্বর্য্য ছিল না, তখন সে শিষ্য হয়েছিল বলে। খাঁটি সাধুরা সহরেও থাকে না। পূর্বে শরতের কেমন স্বভাবটি ছিল! মাটির মত, যেন মাছের রক্ত; কিছুতেই সে রাগত না। সহরের ছোট ছোট ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকলে মন সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। আর প্রশস্ত স্থানে—নদীর পাড়ে বা মাঠের ধারে থাকলে মনটা উদার হয়।

এখনকার লোক করবেই বা কি? কলিতে অধর্মেরই জয়, ধর্মের পরাজয়। ভগবানকে কে চায়? মানযশ টাকাকড়ির জন্যই ত লোক ছুটাছুটি করছে। তাঁকে পাবার জন্য চোখের জল কে ফেলছে?"

জনৈক ভক্ত—মহারাজ, কেউ কেউ বলেন, চোখের জল ফেলা দুর্বলতা।

স্বামী প্রেমানন্দ নীরব রহিলেন দেখিয়া স্বামী ধীরানন্দ বলিলেন—"চোখের জল ফেললেই হল? ভগবানের জন্য চোখের জল ফেলা কি সোজা কথা?"

(২)

বেলুড় মঠ। ২৯শে অক্টোবর, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত। কোন যুবক অল্পদিন পূর্বে মঠে আসিয়া ব্রহ্মচারী হইয়াছেন। মঠে লোকাধিক্যবশতঃ সাধনভজনে তাঁহার অসুবিধা হইতেছিল। তিনি কাশী যাইতে ইচ্ছুক হইয়া ভিক্ষা দ্বারা পাথেয় সংগ্রহার্থ কলিকাতায় গিয়াছেন। নবীন ব্রহ্মচারিগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করেন, ইহা স্বামী প্রেমানন্দ পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি বলিতেছেন—

"লজ্জা হয় না চাকুরী ছেড়ে ভিক্ষা করতে? এখন সমর্থ বয়স। এ বয়সে পরের দ্বারে ভিক্ষায় যাওয়া অত্যন্ত হীনতার পরিচায়ক। সাধু হয়েছ ত পায়ে হেঁটে কাশী যাও না? যতদিনই লাগুক, হেঁটে যাওয়াই উচিত। বাবুটির মত কাশী গিয়ে কয়েক শত জপ করলেই ভগবান এসে দেখা দেবেন? এত সহজে কি ভগবান লাভ হয়? এ ছেলের হাতের মোয়া নয়। (সুর করিয়া গাহিলেন—)

মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে।
এতো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে লবে॥

মাষ্টার মহাশয়ের বইতে ঠাকুরের দুই চার দিনের কথা আছে বৈত নয়। তাতে আছে, নির্জনে তাঁকে ডাকতে হয়। তাঁর জন্য কাঁদে কে? কাঁদতে পারে কে? সত্ত্বগুণ আর তমোগুণ দেখতে এক রকম। তমোতে নিদ্রা, আলস্য, কর্মে অনিচ্ছাদি আসে। স্বামিজী বলতেন, দেশটাকে তমোগুণে পেয়ে বসেছে। বিকারের রোগী ভাবে, সে বেশ আছে, কিন্তু ওষুধ খেতে চায় না। বিকারের ঔষধ বিষ। তমোগুণ ছাড়াতে হলে রজোগুণ আনতে হবে। ভিক্ষা করলে মনুষ্যত্ব চলে যায়। এরূপ ভূতে-পাওয়া তমোগুণী লোক অনেক আসছে। বৈরাগ্য আর তমঃ আলাদা। বৈরাগ্য এলে তাকে কিছু বলতে হয় না' সে কারও কাছে যায় না। পড়ে গিয়ে

দেখি, আমরা খরচ দেব এখন। খরচের জন্য কি কারও পড়া আটকায়? যে পড়াশুনায় মন দিতে পারে না, সে অন্য কাজ করতেও পারে না। এসব তমোগুণী লোক। সত্ত্বগুণীর তেজ কত! তার ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে। লেখাপড়া শিখলে শাস্ত্র পড়া যায়, নানা দেশের ফিলজফি (দর্শন) জানবার সুবিধা হয়। (সুর করিয়া গাহিলেন—)

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি।
যে দেশে রজনী নাই, সে দেশের এক লোক পেয়েছি॥
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥

রজনী কি জান? তমঃ। তার মত তমোগুণী সন্ন্যাসী লাখো লাখো আছে। আর বাড়াও কেন? যার বৈরাগ্য হয়, তার কাছে সংসার সাপ বাঘ বলে বোধ হয়। আর ও করছে ভিক্ষে!”

পরদিন পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, “ভগবান লাভ করতে হলে শাস্ত্রজ্ঞান চাই। ঠাকুর যদিও লেখাপড়া জানতেন না, তবু অনেক শাস্ত্র শুনেছিলেন। সে সব তাঁর বেশ মনে ছিল। কাশীপুর বাগানে শশী মহারাজ ঠাকুরের কাজে অধ্যাত্ম রামায়ণের শুধু মূল সংস্কৃত পাঠ করছিলেন। স্বামিজী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মশায়, আপনি ত লেখাপড়া কিছুই জানেন না। এসব সংস্কৃত কিছু বোঝেন কি?’ তদুত্তরে ঠাকুর বললেন, ‘ওরে না পড়লেও, আমি অনেক শুনেছি। এর প্রত্যেক শব্দের অর্থ আমার জানা আছে।’ ঠাকুরের সবই ছিল অদ্ভুত। শ্যামপুকুরে একদিন মহেন্দ্র সরকার বেলা দশটায় ঠাকুরের কাছে এসে বৈকাল ৩।৪টায় ফিরে গেলেন। তা দেখে মণি মল্লিক বলেছিলেন, ‘মশায়, একদিন কৃষ্ণদাস পালের বাড়ীতে বাউল কি চণ্ডীর গান হচ্ছিল। সভায় যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতি সহরের যত বড় বড় লোক বসেছিলেন। এমন সময় মহেন্দ্র সরকার এসে পাঁচ সাত

মিনিট থেকেই উঠে গেলেন। পাল মশায় তাঁকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে বলায় তিনি বললেন, 'না, আমার ঢের কাজ আছে। আর থাকতে পারি না।' এখন মহেন্দ্র সরকার এখানে পাঁচ সাত ঘণ্টা চুপ করে বসে রইলেন! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!'

"ঘরে বসে কি ঈশ্বর-চিন্তা হয় না? যদু মল্লিকের মা বৃন্দাবন যেতে চাওয়ায় ঠাকুর বলেছিলেন, 'না গো, বাড়ী বসে ভাব।—রাধাজী, আমার কি দুর্ভাগ্য যে, তোমার বৃন্দাবনে যেতে পারলুম না। সেখানে গিয়ে নাতিপুতির ভাবনা ভাবার চেয়ে এখানে থেকে তাঁর চিন্তা করাই ভাল।"

(৩)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মঠের ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত।

বেলুড় মঠে রবিবার ভিন্ন অন্যান্য দিন বৈকাল তিনটার সময় দর্শক কক্ষে শাস্ত্রাদি পাঠ হইত। আজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ হইতেছে। স্বামী প্রেমানন্দের মুখে ঠাকুরের কথা শুনিবার জন্য মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। খানিকটা পাঠ হইবার পর প্রসঙ্গক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, "একদিন গোস্বামী মহাশয় এসে ঠাকুরকে প্রার্থনা জানালেন, 'মশায়, আমার কামটা দূর করে দিন।' তখন ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর লিঙ্গটা স্পর্শ করে দিলেন। এতেই বিজয়কৃষ্ণের কাম দূর হয়ে গেল। আর একদিন একজন লোক এসে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন, "মশায়, আমার বিবাহিত পত্নীর উপর এত টান হয়েছে যে, আর কোনও দিকে মন দিতে পারছি না। সব কাজকর্ম পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। আমার এ ভাব দূর করে দিন।" ঠাকুর তাকে বললেন, "একদিন কিছু ফলটল নিয়ে আসিস, তোর মায়া খেয়ে ফেলব।" শেষে কিন্তু তার দেওয়া জিনিষ খেতে গিয়ে তাঁর হাত মুখে উঠল না। শুনেছি, ঐ লোকটি পরে সেই স্ত্রী নিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছিল এবং শেষে মারা গিয়েছিল।

দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায় বেলুড় মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে ইনি দীর্ঘ কাল ঠাকুরের সেবা করিয়াছেন এবং সুমিষ্ট স্বরে গান গাহিয়া ঠাকুরকে শুনাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু ও ভক্ত সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন এবং রামলাল দাদা বলিয়া ডাকেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সহিত বালকের ন্যায় হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর রামলাল দাদা আর বিবাহ করেন নাই, তাঁহার ছেলেরাও সাবালক হইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে তিনি মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে আসিয়া কিছু কাল সাধুসঙ্গে কাটাইতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সংসারের জন্য ব্যস্ত থাকায় ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে মাঝে মাঝে সপ্রেম মৃদু ভৎর্সনা দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে রামলাল দাদা বলিয়াছিলেন "পূর্বে ঠাকুর, হৃদয় মুখুজ্যে প্রভৃতি কুঠির পূর্ব দিকস্থ বড় ঘরে থাকতেন, আর তার পাশের ছোট ঘরে ঠাকুরমা। তাঁরা রাত্রে শুনতেন, একজন লোক জুতা পায়ে উত্তরের গোল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল, আবার নামল, দরজা ও খরখড়ি খুলল, ছিটকিনি দিল ইত্যাদি। সেটি সাহেব ভূত। ও বাড়ীতে আগে সাহেব ছিল। ঠাকুর বলতেন, "এ জগৎ যে একেবারে মিথ্যা তাও বলা যায় না। কেন না, দেখছি চোখের সামনে এমন দৃশ্যমান জগৎ রয়েছে। আবার, এ জগৎকে ঠিক সত্যও বলতে পারি না। কারণ দেখ, এই বাগান আগে গোরস্থান ছিল, এ কুঠিতে সাহেবরা থাকত; এখন দেখ, কি হল। আবার দুদিন পরে এও যাবে। তার পরে কি হবে কে জানে?"

ঠাকুর একদিন আমায় বলেছিলেন, 'দেখ, একদিন ভাবে দেখলাম, মার চারদিকে কতগুলি লোক, 'জয় কালী,' 'জয় কালী' বলে হাততালি দিয়ে ঘুরছে। আর ঘরের নৈঋর্ত কোণে রাণী রাসমণি জোড় হাতে

দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখলাম, ঐ লোকগুলির মধ্যে মথুর, শম্ভু, বলরাম, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি ছিল। ঐ সঙ্গে কতগুলি সাদা সাদা মাগী ও মিন্‌সে দেখলাম। তারা কে এখনও বুঝতে পারছি না।'

স্বামী প্রেমানন্দ—ওরা সব সাহেব মেম। একটি বিলিতি মেম এখানে এসেছিল। ঠাকুর-ঘরে পাদুকা ইত্যাদি দেখে সে কাঁদতে লাগল। তাঁর কাপড়, কমণ্ডলু ইত্যাদি দেখে একটু ছিঁড়ে নিয়ে বললে, সর্বদা বুকে রাখব পুণ্য স্মৃতি-চিহ্নরূপে।

রাত্রে ইংরাজী পুস্তক পাঠ হইতেছে। পাঠের পর স্বামী প্রেমানন্দ উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এ সব যা পড়ছ, শুধু পড়ে গেলে হবে না। এ সব ধ্যান করবে, আর ঐ ভাবে জীবন গঠন করবে। ঠাকুরের কৃপায় যে যে এখানে এসেছ, কেউ কম নও। তোমরা সিংহের শাবক। লোকের কাছে শুধু এ বললে চলবে না, আমরা এই জানি, স্বামিজী এই এই বলেছেন। তোমাদের নিজেদের জীবনের দ্বারা দেখাতে হবে যে এরূপ করা উচিত। তোমরা প্রত্যেকে ত্যাগ, বিবেক ও বৈরাগ্যের আদর্শ হবে।"

(৪)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে। মঠস্থ বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত। বৈকালিক পাঠের সময় স্বামী প্রেমানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠিক ঠিক নিষ্ঠা চাই। আবার নিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্য দেবতার উপর বিদ্বেষ না আসে, যেমন বৈষ্ণবদের। বড়দা একটা গল্প বলেছিল, মনগড়া কথা নয়, সত্য ঘটনা। একটি বড় লোকের বাড়ীতে মা কালী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। সেখানে নিত্য ভোগরাগের বিরাট ব্যবস্থা আছে। একদিন একটি বৈষ্ণব এসে প্রতিমার কাছে প্রণাম করে বলছেন, 'বড় বৌদি, দাদা কেমন আছেন?' বাবুটি ব্যাপার বুঝে বৈষ্ণবকে সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একখানা ভাল আসন দিয়ে বলছেন, 'মহাশয়, আসুন

বসুন।' এদিকে গোপনে একজনকে আদেশ দিলেন, 'ওরে মেয়েদের বল্লে কতগুলি বুনো কচু কেশুরের মত কেটে একটা থালায় করে নিয়ে আয় ত।' তারপর কচু এনে বৈষ্ণবকে সে ভাবে দেওয়া হল। ওর একখণ্ড খেতেই বৈষ্ণবের মুখ কুট্ কুট্ করতে লাগল।

বাবু—কেন খাচ্ছেন না মশায় ?

বৈষ্ণব—আজ্ঞে এযে কচু !

বাবু—শালা, তোমার দাদা ঘড়া ঘড়া বিষ খেয়ে হজম করেন আর তুমি এক থালা কচু খেতে পারবে না ! কে আছিস রে, লাঠি নিয়ে আয় ত, সব কচু না খেলে শালার মাথা ভেঙে দিবি।

বৈষ্ণব—মহাশয়, ক্ষমা করুন। ঘাট হয়েছে, আর এমন কথা কথনো বলব না।

বাবু—তবে কেন এমন কথা বলেছিলেন ?

বৈষ্ণব—আজ্ঞে, এই প্রসাদের লোভ হয়েছিল। ভেবেছিলুম, আমি কালীর দেবর, এ কথা বুঝলে এখানকার লোকেরা আমায় যত্ন করে বেশী প্রসাদ দেবে।

বাবু—তবে এই এক থালা প্রসাদ খাও, আর এই যোল টাকা দক্ষিণা নাও। আর এ মুখো হয়ো না, বা এমন কথা বলো না।

আবার ঠিক ঠিক নিষ্ঠা দ্বেষশূন্য হলে শীঘ্র ভগবান লাভ হয়। এ বিষয়ে ঠাকুর একটা গল্প বলেছিলেন। এক বাড়ীতে দুই ভাই ছিল, দুজনেই নিষ্ঠাবান্। ছোট ভাই গোপাল-ভক্ত, আর বড় ভাই কালী-ভক্ত। তাদের বাগানে এক ছড়া খুব ভাল কলা হয়েছিল। প্রত্যেকেই ভাবছে, এ কলা পাকলেই আমার ইষ্টদেবতাকে ভোগ দেব। একদিন গোপাল-ভক্ত ছোট ভাই কোন কাজে বাইরে চলে গেল। আর এদিকে কলা পেকে যাওয়ায় বড় ভাই মহানন্দে কলাছড়া কেটে নিয়ে মা কালীর ভোগ চড়িয়েছে। ছোট ভাই এসেই দেখে, কলা নেই। 'কী! গোপালের জন্য কলা রেখেছি,

তাই দিয়ে কালীর ভোগ!' এই বলে সে এক গাছি মোটা লাঠি নিয়ে কালীঘরে হাজির এবং কালীর মাথা ভাঙতে উদ্যত। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে লাঠি ছেঁকেই দেখে, কালী নেই, গোপাল রয়েছেন। "হায় হায় কি সর্বনাশ! গোপাল, অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর।" এই বলে, ভুলে গোপালের ঘরে ঢুকেছে মনে করে লাঠি নিয়ে অপর ঘরে গিয়ে দেখে, সেখানেও গোপাল রয়েছেন।

তখন তার দিব্য জ্ঞান হল। সে বুঝতে পারল, যিনি কালী, তিনিই গোপাল। সিদ্ধ হলে গোঁড়ামী থাকতে পারে না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন। পরে ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া করে উদার হলেন এবং ব্রাহ্ম দল ছেড়ে নির্জনে তপস্যা ও মালাধারণ করলেন। তিনি একদিন ঠাকুরের কাছে অতি বিনীতভাবে বলেছিলেন, 'মহাশয়, অনেকে মন্ত্র নিতে চায়, দিব কি?'

ঠাকুর—সে কি, তুমি অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। তুমি গুরু হয়েই জন্মেছ, তুমি মন্ত্র দেবে বৈ কি।

স্বামিজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলে গোঁসাইজী তাঁকে ডাকিয়েছিলেন নিজের অসুখ বলে। স্বামিজী তাঁর কাছে গেলে তিনি নিজের আসন ছেড়ে তাঁকে বসতে দিলেন। কিন্তু স্বামিজী তাতে কিছুতেই বসতে চাইলেন না দেখে গোঁসাইজী বললেন, 'তোমায় ঠাকুর কি চোখে দেখতেন, তা ত জানি। আমরা তোমায় কি করে চিনব?' তখন স্বামিজী সেই আসনে বসলেন এবং গোঁসাইজী স্বয়ং নীচে উপবেশন করলেন। তা দেখে তাঁর শিষ্যেরা কটমট করে তাকাতে লাগল।

(৫)

বেলুড় মঠ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাসের শেষ সপ্তাহ। মঠের বহু সাধু ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত। মঠের দর্শক-কক্ষে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠ হইতেছে। শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দ কথা

প্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, এই কেদার চাটুজ্যে রায় রামানন্দের অবতার। ইনি আগে লাহোরে চাকরী করতেন ও ব্রাহ্ম মতানুবর্তী ছিলেন। তিনি পরম ভগবদ্ভক্ত ও বৈরাগ্যবান্। ভগবান লাভ হল না বলে একদিন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটী রাখাল বললে, কি করছেন? হঠাৎ এই বাধা পেয়ে তিনি ব্যাকুল ভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ভগবান্ লাভ হবে?' রাখাল উত্তর দিল, 'আলবৎ হোগা।' নির্জন পর্বতে অপরিচিত সরল-প্রাণ রাখালের এই বাক্য তিনি ভগবদ্বাক্য বলে বুঝলেন। তখন তাঁর মনে হল, এ দেশে কিছু হবে না, বাঙলা দেশে যাই। তখন ওখান থেকে কলিকাতা আসবার সময় কে যেন তাঁকে জোর করে বালীতে নাবালে এবং গঙ্গা পার করে একেবারে ঠাকুরের কাছে নিয়ে হাজির করলে। এখানে রেলওয়ে আফিসে হিসাব পরীক্ষকের কাজ করতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে বিজয় গোস্বামীর সহিত তাঁর খুব ভাব ছিল। একদিন গোঁসাইজী কতিপয় লোককে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তারা গিয়ে দেখে, কেদার বাবু আফিস থেকে এসে একটু জল খেয়ে বেশ্যা-পল্লীতে ঢুকলেন। তারা ফিরে গিয়ে গোঁসাইজীকে একথা বললে। তিনি পরদিনও তাদের যেতে আদেশ দিলেন। সেদিন তারা কেদার বাবুর পেছনে পেছনে গিয়ে একেবারে বেশ্যাবাড়ীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তারা অবাক্ হয়ে দেখলেন, কেদার বাবুর চারদিকে বেশ্যারা সব জমেছে, আর প্রণাম করে বলছে, "মহাশয়, আমাদের কি উপায় হবে? কত জপ করছি, কিন্তু মনের কুভাব ত কিছুতেই যাচ্ছে না।"

পাঠক—চৈতন্যদেবের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দুরকম মত দেখা যায়।

স্বামী প্রেমানন্দ—সব কথা বিশ্বাস করবে কেন? 'চৈতন্যচরিতামৃত'

পড়েছ ত ? টাকা বাজিয়ে নিতে হয়। প্রামাণ্য পুস্তকে যা আছে, তাই বিশ্বাস করবে। অমুকে বললেই শুনবে কেন ? ঠাকুর সাপের যে গল্পটি বলতেন তা জান না ? ফোঁস করবে, কিন্তু কামড়াবে না। মনে খুব জোর চাই। (সুর করিয়া গাহিলেন—)

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

তাই বলে এখন খুব পাপ করে নি, মরবার সময় দুর্গা দুর্গা বলব—এ ভাব ভাল নয়। 'এমনি জোর করে বরাবর নাম না করে গেলে মরবার সময় নাম মনেই আসবে না।

'কথামৃত' পাঠান্তে পুনরায় স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, "ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম হচ্ছে অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ। নয় ত কেবল পড়ে যাচ্ছি, এতে কিছুই হবে না। সময়মত বেশ আমটাম চলছে, একটু একটু ধ্যানও করছি—এরূপ ম্যাদাটে ভাবে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হলে খুব ছট্‌ফটানি চাই, আন্তরিক ব্যাকুলতা চাই।

ভগবান যেমন মায়া দিয়ে আমাদিগকে সংসারে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছেন, তেমনই আবার কৃপাবশে অবতীর্ণ হয়ে সাধন ভজন করে দেখাচ্ছেন, কিরূপে তাঁর মায়া কাটাতে হবে। তিনি নিজেই এসে এই মায়ার ঘর ভেঙ্গে চুরে দিচ্ছেন। এক বাবু পাঁচ ছয়টি ছেলেপুলে নিয়ে বাগানে বেড়াতে এসেছিল। সেখানে কেউ আমগাছ দেখছে. কেউ ফুল তুলছে, কেউ ডাব পাড়ছে, কেউ বা ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বসেছে। সন্ধ্যার সময় বাবু বাড়ী ফিরবেন, সব ছেলেকে ডাকলেন। ছিপওয়ালা ছেলে আর আসছে না। বাবু তার কাছে লোক পাঠালেন। সে বললে বাবাকে বল গে, এখন সন্ধ্যের সময়টা মাছ খাবে। এই খেপটা দেখে যাই। বাবু

ঘোড়াগাড়ী জুড়তে হুকুম দিলেন। তিনি গাড়ীতে উঠে দেখেন ছেলে এখনও আসেনি। তিনি আবার তাকে ডেকে পাঠালেন। ছেলে বললে, এই যাচ্ছি, চারায় মাছ এসেছে। এখন রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে বাবু নিজেই গিয়ে ছিপ টেনে তুলে ভেঙেচুরে জলে ফেলে দিলেন। আর ছেলেটিকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গাড়ীতে তুললেন। তেমনি সময় হলে ভগবান নিজেই এসে আমাদের খেলার ঘর ভেঙে দিয়ে নিজের কাছে টেনে নেন।

একটি ভক্ত কলিকাতা হইতে মঠে আসিবার সময় কোন দোকানে পান্তুয়া প্রস্তুত হইতে দেখিয়া কিছু আনিয়াছেন ঠাকুরের ভোগের জন্য। উহার কতকাংশ বৈকালে ভোগের সময় নিবেদিত হইয়াছিল। রাত্রিতে প্রসাদ গ্রহণের সময় দেখা গেল, পান্তুয়ায় তখনও রস ঢোকে নাই। তখন স্বামী প্রেমানন্দ ভক্তটিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভেবেছিলুম, তুমি রসিক লোক। কিন্তু এ পান্তুয়া দেখে বুঝতে পারছি, তুমি নীরস। কেউ কিছু আনলে তা দেখে বোঝা যায় সে কেমন লোক।"

(৬)

বেলুড় মঠ। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ, ৮ই মে। বেলা প্রায় দেড়টা। মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী ও গৃহী ভক্ত উপস্থিত।

স্বামী প্রেমানন্দ মঠস্থ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং আগন্তুক ভক্তদের সহিত বসিয়া একত্র মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিয়াছেন। আহারের পর তিনি সাধারণতঃ প্রায় এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া থাকেন। আজ বিশ্রামার্থ দ্বিতলে যাইবার পূর্বে কয়েকটি ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেছেন—

"ঠাকুর খুব লেবু ভালবাসতেন বলে যোগেন তাঁকে রোজ একটা করে লেবু এনে দিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে বলছেন, ওরে কাল কোত্থেকে

লেবু এনেছিলি? আমি সেই লেবু খেতে পারিনি। যোগেন জানতেন, ঠাকুর যার জিনিষ খেতে পারেন না, সে অতি অপবিত্র ও নীচ। কিন্তু তিনি আগে যে গাছের লেবু আনতেন, সেদিনও সেই গাছের লেবুই এনেছেন। তবে এরূপ কেন হল? অনেক ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলেন না তার পর বহু অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারলেন, তিনি যার কাছে চেয়ে তার বাগানের লেবু আনতেন, সে পূর্বদিন থেকে ও বাগানের উপর স্বত্ব হারিয়েছিল, সে বাগানের বন্ধকের সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাই যদিও তিনি বাগানওয়ালার অনুমতি নিয়েই সেখান থেকে রোজ একটি করে লেবু আনতেন, তবু ঠিক সেদিনই ঐ গাছে তার কোনও স্বত্ব না থাকায় বাস্তবিক লেবুটি চুরি করা হয়েছিল। ঠাকুর তাঁকে দেওয়া জিনিষে দাতার মনোভাব পর্য্যন্ত বুঝতে পারতেন, আর কোন খাবার জিনিষে তিলমাত্র পাপস্পর্শ হলে তা তাঁর মুখে উঠত না। কি অপূর্ব পবিত্রতা! তিনি অপবিত্রতার সংস্পর্শ বা সান্নিধ্যও সহ্য করতে পারতেন না। তাই তাঁকে পেতে হলে হৃদয়টি সম্পূর্ণ পবিত্র করতে হবে, চাঁদ। সমস্ত রিপুগুলি জয় করা চাই। কারণ কোন জিনিষে লোভ হলে জিভটাকে রিপু-মলে ডুবাতে হয়। এখানে যারা আসবে তাদের ideal (আদর্শ) সাধু হতে হবে। ঠাকুরের ছেলেরা এ রাজ্যের লোক নয়। তোরা সেই ঠাকুরের ছেলে, বুঝলি? কিন্তু তা বলে অহঙ্কার করতে পারবি না। ওটাকে একেবারে দূর করে দিতে হবে। রাখাল মহারাজ মাঝে মাঝে বলেন, তিনি এক একবার ভাবেন, তিনি যেন এ রাজ্যের লোক নন। ঠাকুর বলতেন, নরেন, রাখাল, এরা কাছে না থাকলে কার সঙ্গে কথা কই? এরা শুদ্ধসত্ব নারায়ণ। বিষয়ীদের সঙ্গে কথা কইলে ঠোঁট যেন পুড়ে যায়। কি পবিত্রতা! তোদের তেমনি পবিত্র হতে হবে।"

রাত্রে আরাত্রিকের পর স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরকে শয়ন করাইতেছেন। তৎকালে জনৈক ভক্তকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া ঠাকুরের শয়ন দেখিতে

তাহাকে নিষেধ করিলেন। তৎপরে তিনি নীচে আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

ভক্ত—মহারাজ, কি করলে তাঁর পাদপদ্মের দর্শন পাওয়া যায় বলে দিন।

স্বামী প্রেমানন্দ—তোমরা যাকে দর্শন করেছ, তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করেছ। তোমাদের ভাবনা কি?

ভক্ত—কিন্তু মহারাজ, কিছুতেই ত মন স্থির হয় না। কি করলে মনটা শান্ত হবে বলুন।

প্রেমানন্দজী—একি ছেলের হাতে মোয়া যে, ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেবে? কিন্তু ভেবো না।' ঠাকুর বলতেন, 'ওরে আমি বিন্দুতে সিন্ধু দেখি। আমরা এক পা এগুলে তিনি হাজার পা এগোন। যাঁরা তাঁর নাম নেন তাঁদের ভাবনা কি? ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁর নাম করতে থাক, ক্রমে সব হয়ে যাবে।

ভক্ত—মহারাজ, শুনেছি ত্যাগ করতে না পারলে তাঁর কৃপার অধিকারী হওয়া যায় না।

প্রেমানন্দজী (রুক্ষভাবে)—তোমার কি আছে যে, ত্যাগ করবে? তিনি যেখানে যেভাবে রাখেন, সেখানে সেভাবেই থাকবে। কিছু করে তাঁকে পাওয়া যায় কি? তাঁর কৃপা হলে সব হতে পারে। কতজন বহু সাধনেও তাঁর কৃপা পায় না, আবার অনেকে খুব সহজে তাঁর কৃপা লাভ করে। তাঁর বালকের স্বভাব। যেন একটি বালক কোঁচায় করে কতকগুলি মণিমাণিক্য নিয়ে রাস্তার ধারে বসে আছে। কোন পথিক যদি বলে, 'ওরে, আমায় দিবি?' তখন হয়ত সে তার নুড়টি ধরে বলে, এইটি পাবে। আবার কতক্ষণ পর হয়ত আপনি খুশী হয়ে রাস্তার ওপাশের লোক ডেকে বলে, 'নিয়ে যা, নিয়ে যা।'

(৭)

বেলুড় মঠ। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত। স্বামী প্রেমানন্দ প্রাতে স্নানান্তে ঠাকুর-ঘরে যাইয়া জনৈক ভক্তকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকাযুগল অনেকক্ষণ তাঁহার বক্ষে ও মস্তকে স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। তৎপরে উহা স্বীয় মস্তকে স্পর্শ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। বৈকালে সুরেন বাবু তাঁহার জনৈক বন্ধুর সহিত বিবেকানন্দ মন্দিরের সম্মুখস্থ বেলতলায় বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ পাদচারণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু প্রমুখ ভক্তগণকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গেল। তিনি অবিশ্রান্তভাবে ভগবৎপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী ভালবাসা সম্বন্ধে প্রেমানন্দজী বলিলেন, "বাড়ীতে থাকলে পাঁড়াগায়ে বদ্ ছোকরাদের সঙ্গে মিশে আমার স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে বলে মা আমায় স্কুলের ছুটির সময়ও আটপুর গ্রামস্থ বাড়ীতে থাকতে দিতেন না। কিন্তু আমার কলিকাতা আসবার কালে তিনি কাঁদতেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছ থেকে কলিকাতা ফেরবার সময় ঠাকুরও আমার জন্য কাঁদতেন। আহা! তিনি যে আমাদিগকে কত ভালবাসতেন, তা তোমাদের কেমন করে বোঝাব? পূর্ণকে খাওয়াবার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ী করে তিনি কলিকাতায় যেতেন। পূর্ণের স্কুলের কাছে গাড়ী রেখে লোক পাঠিয়ে তাকে ডাকাতেন এবং কাছে বসিয়ে নিজের হাতে খাওয়াতেন। আবার ঠাকুর বলতেন, "ওরে আমার কি হল বল দেখি। তোদের ত একখানা মাদুরও নেই যাতে আমাকে বসাতে পারিস। কিন্তু তোদের দেখবার জন্য অস্থির হই।" আর একদিন বলরাম বাবু বাড়ীতে নেই। আমাকে দেখবার জন্য ঠাকুর ওঁর বাড়ীর কাছে ঘুরছেন। ঘরের মধ্যে ঢুকছেন না, পাছে কেউ কিছু বলে! তার পরে একজন তাঁকে বাড়ীর ভিতর ডেকে আনলেন। তাঁর প্রেম ভালবাসা ছিল অনন্ত। তার

এক বিন্দুতে আমাদের হেউঢেউ হয়ে যায়। তাই সবাই ভাবত, তিনি তাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি বলতেন, 'সব পারি, কেবল অহং ব্যাটাকে পারি না।' তাইত কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে হৃদুকে পাঠাতেন দেখতে, তার অহঙ্কার আছে কি না। তিনি ছাঁচ তুলে রেখে গেছেন। এখন আমরা মনটাকে কাদার মতন পা দিয়ে চটকে চটকে ছানব, আর তা থেকে কাঁকরগুলি সব ফেলে দেব। তখন সেই ছাঁচ থেকে অনায়াসে ছবি উঠবে। ভয় কি, তিনি জগতের জন্য এসেছিলেন। ডুব দাও তাঁর নামে।"

আর একদিন একটি ভক্ত বাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি প্রথম দিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে কি দেখলেন, দয়া করে বলুন।"

স্বামী প্রেমানন্দ—সেদিন রাত বারটার পর একটি ভক্তের সঙ্গে শুয়েছিলাম। দারোয়ানদের জোরাল চীৎকারে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। একটু ঘুম আসতে না আসতেই ঠাকুর এসে উপস্থিত—একেবারে উলঙ্গ, কাপড় বগলে তাল-পাকান। আমাদের ডেকে তুলে বললেন, "নরেন্দ্রকে জান? বেশ ছেলে, সিমলায় থাকে, গান বাজনা পড়া সবটাতে ভাল। তাকে বলবে, একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে। তাকে বলবে, কালই গাড়ী করে আসতে। এখান থেকে ভাড়া দেব।" এই কথা বলে তিনি চলে যাওয়ার পর আমরা শুয়েছি। একটু পর তন্দ্রা আসতে না আসতেই তিনি তেমনি করে আবার এসে উপস্থিত। এসে বললেন, "দেখ, তাকে একবারটি আসতে বল। বেড়াল যেমন নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়, তার জন্য আমার বুকের ভিতর তেমনি আঁচড়াচ্ছে। কালই তাকে আসতে বল, কেমন? বলবে ত?" এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। আমি তখন ভাবছি, "আহা, ইনি তাকে কত ভালবাসেন, আর সে ছোকরা একবারও এসে দেখা দেয় না! কি নিষ্ঠুর! কি পাষণ্ড!" ইতোমধ্যে তিনি আবার এসে হাজির হলেন এবং আমাদিগকে

মিনতি করতে ও নরেন্দ্রকে প্রশংসা করতে লাগলেন। সে রাত্রি এভাবেই কেটে গেল। বাস্তবিক, ভগবানের জন্য এরূপ ব্যাকুলতা হলেই তাঁর দর্শন লাভ হয়। সে দিনে ঠাকুর আমাকে তাই শেখালেন।

আর একদিন ঠাকুরের ঘরে অতি সন্তর্পণে শুয়ে আছি। অনেক রাতে জেগে দেখি, ঠাকুর কেবল ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করছেন আর বলছেন, "মা, ও আমি চাই না; লোকমান্য আমায় দিস নি। দিস নি মা, দিস নি। থ্যাক্ থুঃ। লোকমান্য চাই না মা।" এই বলে ঠাকুর পাগলের মত কেবল ঘরের এধার থেকে ওধার বেড়াতে লাগলেন এবং থুথু ফেললেন। এসব দেখে আমি ভাবতে লাগলুম, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে লোকমান্যের জন্য জগতের লোক পাগল ইনি তাই এড়াবার জন্য মার কাছে এত কাকুতি মিনতি করছেন। আর আমার সামনেই বা এসবের উদ্দেশ্য কি? অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর বুঝি আজ আমাকে শিক্ষা দিতেই এরূপ করছেন।

(৮)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৩০শে মে। মঠস্থ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত। বৈকালে দর্শক-কক্ষে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ হইতেছে। 'কথামৃত' পাঠকালে জিজ্ঞাসা উঠিল, যাঁহারা ঠাকুরের কাছে আসিতেন, ঠাকুর তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবার পূর্বে তাঁহাদের নানা লক্ষণ দেখিতেন এবং তাঁহাদের কে আছে বা দেনা আছে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতেন।

একটি ভক্ত—তা হলে দেখছি, সকলেই ঠাকুরের কৃপার অধিকারী হতেন না। একটা গানে আছে, "হই না কেন যেমন তেমন স্থান পাব রাঙা চরণে" ইত্যাদি। ওটা তবে ঠিক নয়?

স্বামী প্রেমানন্দ—কেন? তিনি গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি, এমন কি অনেক বেশ্যাকে পর্যন্ত, দয়া করেছেন। একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুরের ঘরে বসে আছেন। তখন রমণী নামে এক বেশ্যা

পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ঠাকুর তাকে বললেন, "কি গো, এখন আর যে এদিকে আসটাস না। কেনই বা আর আসবে! নূতন নূতন লোক পাচ্ছ, আর আমাদের মনে থাকবে কেন?"

মেয়েরা ভাবছেন, "ছি ছি, ঠাকুর কি একটা বেশ্যার সঙ্গে কথা আরম্ভ করেছেন!" তখন ঠাকুর তাঁদের বললেন, চল গো, মাকে দেখবে। কালী-ঘরে গিয়েই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে মাকে বলছেন, "মা, তুইই রমণী হয়েছিস। তুই বেশ্যাও হয়েছিস, আর সতীও হয়েছিস।" তখন মেয়েরা বুঝলে, "রমণী বেশ্যাকে ঘৃণা করে বড় অন্যায় হয়েছে। আমরাও যা, সেও তাই। ঠাকুর ওকে মাকালীরূপে দেখেই এভাবে আলাপ করেছেন। আমাদের সতীত্বের অহঙ্কার করার কিছুই নেই। তাঁর ইচ্ছাতে আমরা সতী, আর সে বেশ্যা। সব ইচ্ছাময়ীর লীলা।"

ভক্ত—ঠাকুর ওরূপ করলেও আমরা ওদের পতিতা না ভাবলে দূরে থাকতে পারব কেন? ঘৃণা না করলেও, তাদের দয়ার চোখে দেখা উচিত। বাগবাজারে আমার মামার বাড়ীর পাশে এক বৃদ্ধা বেশ্যা বাস করে। সে ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিল। সে মাঝে মাঝে মামার বাড়ীর ভিতরে এসে পাতা নিয়ে খেতে বসে যায়। আমার কিন্তু তাকে দেখলেই গা জ্বলে যায়। সেজন্য ওদের মন্দও বলেছি।

স্বামী প্রেমানন্দ—বেশ্যাদের ঘৃণা করবে কেন? দয়া পর্য্যন্ত অহঙ্কার থেকে হয়। বাঘ নারায়ণ, হাতী নারায়ণের গল্প শোন নি? ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হলেই কি ঘৃণা বা দয়া করতে হবে নাকি? দূর থেকে নমস্কার করবে আর ভাববে, তাঁর ইচ্ছায় এরা এমন হয়েছে এবং তাঁর কৃপায় আমি এমন আছি। এই সবই তাঁর অচিন্ত্য লীলা। আবার তাঁর ইচ্ছা হলে এক মুহূর্তে বেশ্যাও উদ্ধার হয়ে যেতে পারে, আর আমিও পতিত হতে পারি। অহঙ্কার অভিমান একেবারে নাশ করতে হবে। উপরোক্ত রমণী এখন মহাভক্ত হয়েছে। কারু সঙ্গে দেখা হলে কাঁদে, আর বলে

"তিনিও নেই, তোমরাও আর আস না। কার সঙ্গে বা কথা বলি, আর কি নিয়েই বা থাকি ?"

(৯)

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭ই জুন। মঠের কয়েকটি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত। বৈকাল বেলা দর্শককক্ষে 'কথামৃত' পাঠান্তে স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন—

"প্রত্যেক সাধককে এক একটা ভাব আশ্রয় করে তাতে লেগে থাকতে হয়। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি অন্য ভাবের প্রসঙ্গ বা গান হলে তাতে নিজেকে মগ্ন না করে ভাববে, আমি আমার নিজের ভাবে মগ্ন হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছি এবং নিকটে অন্য ভাবের অভিনয় হচ্ছে। আহা এই ভাবটি কি মধুর। শান্তভাব ছিল ঋষিদের। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে শান্তভাব আসে। তখন ঈশ্বরের নামজপাদি ভিন্ন অন্য কিছু করণীয় থাকে না। কত রকম ভাব আছে। সখীভাবে, সখার ভাবে, শ্রীরাধার মধুরভাবে, আবার বলরামের ভাবে সাধনা করে ঠাকুর সিদ্ধ হয়েছিলেন। বীরভাব, পশুভাবও আছে। মহাদেবের ভাবেও সাধন করতে দেখা যায়। সব সাধনের প্রাণ তীব্র বৈরাগ্য। এই জন্যই 'তাঁকে লাভ করতেই হবে,' এরূপ ব্যাকুলতা চাই। "বনত বনত বনি যাই" ভাবে তাঁকে পাওয়া যায় না। এটা তোমরা ভাল করে শুনে রাখ। নইলে কেউ account (হিসাব) নিয়ে, কেউ cash (টাকাকড়ি) নিয়ে থাকলে হবে না। এখানে ও আমেরিকায় ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ হচ্ছে—তাতে আমাদের কি ? প্রত্যেকের হৃদয়ে ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ করতে হবে। তাতে ইঁট, চূণ, সুরকি, টাকা দরকার হয় না। তাতে বটগাছ হয়ে ভেঙে যাবে না। হরি হরি বলে তাঁতে ডুব দাও।"

পরদিন স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে স্বামী প্রেমানন্দের মাতা ঠাকুরাণী বেলুড় মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। প্রসাদ প্রাপ্তির পর বিশ্রামান্তে একটি ভক্ত

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর যখন বাবুরাম মহারাজকে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন, তখন তিনি আপনাকে কি বলেছিলেন ?

প্রেমানন্দজীর মাতা—তিনি বলেছিলেন, "তোমার এ ছেলেটি আমায় দাও। ও এক গ্লাস জল দিলে আমার তৃপ্তি হয়।" আমি বললুম, ছেলে কি কেউ অমনি দেয় গা ? তখন তিনি হেসে বললেন "তো-তোমাকে আর কি দেব ? তোমার ই-ইষ্টে ভ-ভক্তি হোক।"

স্বামী প্রেমানন্দ যখন অন্তিম বয়সে প্লীহাবৃদ্ধি ও কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন তখন তিনি স্বাস্থ্যোন্নতি ও চিকিৎসার জন্য বৈদ্যনাথধামে এস. পি. রায়ের বাংলোতে প্রায় এক বৎসর অবস্থান করেন। ভক্তবীর বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুও জলবায়ু পরিবর্তনার্থ সেই সময় তথায় ছিলেন ব্রহ্মচারী সতীশ, কানাই ও মতিলাল পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের সেবায় নিযুক্ত। বাবুরাম মহারাজ একদিন কোন সেবককে বলেন, "রাম কতটুকু খায় রে ! তার নাম করে রোজ রোজ মিষ্টান্ন খাচ্ছ। খেয়ে খেয়ে তোদের জিভ্ এক হাত লম্বা হয়েছে।". এই তীব্র তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া এক সেবক পলাইয়া যান। তিরস্কারের পরই প্রেমানন্দজী বলতেন, "আরে রোগে ভুগে ভুগে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। তাই তোদের বকি। কিছু মনে করিস্ নি।" অন্য সময় বলেছিলেন, "ওরে তোদের ভালবাসতে পারলুম কই ? তাহলে ত তোদের কিনে নিতে পারতুম। আহা ! ঠাকুর আমাদের যে রকম ভালবাসতেন তার শতাংশও কি তোদের ভালবাসতে পারছি ?"

———

চৌদ্দ

স্বামী সুবোধানন্দের কথোপকথন

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীঃ জুন মাস। ব্রহ্মচারী নন্দ, এবং অন্যান্য সাধু ও ভক্তবৃন্দ সমবেত। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী সুবোধানন্দ বলিলেন, "কাশীপুরে একদিন ছোট নরেন (যিনি এটর্নী ছিলেন) ঠাকুরের কাছে বসে একখানা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঠাকুর অমনি হাত জোড় করে তাকে বললেন, "ও এখানে নয়, নীচে গিয়ে পড়।"

ব্রহ্মচারী নন্দ—ঠাকুরের মনটি যেমন শুদ্ধ ছিল, শরীরটিও তেমনি কোমল ছিল। একদিন খাওয়ার সময় লুচি ভাঙতে হাত কেটে গেল। সু—মহারাজ এক দিন খুব জোরে তাঁকে হাওয়া করছিলেন। তাতে তাঁর গায়ের লোম নড়ায় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তাই আস্তে আস্তে এক দিকে হাওয়া করতে বললেন।

স্বামী সুবোধানন্দ—ইঞ্জিনীয়ার এখানে বিধবা মেয়েদের স্কুল করতে চেয়েছিল। আমি বললাম, এ মঠের কাছে নয়, আমার ত' দেখছ দাঁত পড়ে গেছে। তবুও ঐ বেটীদের দেখলে সঙ্কোচ হয়। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের খুব সাবধান থাকা উচিত। একদিন সুরেশ মিত্র শ্রীমাকে দশ টাকা দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। তা দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "হাঁ হে, তুমি কি ব্রাহ্মণের মেয়েকে টাকার লোভ দেখাতে চাও না কি? ওর যা আছে তাতেই চলবে।"

ভক্ত—ঠাকুর কাদের ঈশ্বরকোটি বলতেন মহারাজ?

স্বামী সুবোধানন্দ—তিনি শুধু স্বামিজীকেই ঈশ্বরকোটি বলতেন, আর কাউকে নয়। রাখাল মহারাজকে খুব বড় আধার, নিত্যসিদ্ধ বলতেন। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মহাশয়, এত

লোকের ত ভাব হয় দেখছি, এদের মধ্যে কার কার ভাব ঠিক ?" তিনি একটু থেমে উত্তর দিলেন, "লাটুর। তার বুকে আমি পা না দিলে ভাব ভাঙে না।"

রামবাবুর বাড়ীতে কীর্তনে একজন লোক কপট ভাবে আর একজনের অণ্ডকোষে এমন গুঁতো মেরেছিল যে, লোকটি চীৎকার করে উঠেছিল। এতে ঠাকুরের ভাব ভেঙে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রথম লোকটাকে এমন এক চড় মেরেছিলেন যে, সে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। হরি মহারাজ এক সময় ঢাকায় কোন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তনে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা লোক ভাবের ভান করে একটি যুবতী স্ত্রীলোককে জড়িয়ে ধরেছিল।

ভবনাথ একদিন ঠাকুরকে বলেছিল, "মহাশয়, নরেন বেশ্যাবাড়ীতে যায়, অখাদ্য খায়," ইত্যাদি। ঠাকুর তা শুনে রেগে বললেন, "একটা কেন, হাজারটা মাগীবাড়ী সে যাবে, যা খুসী সে খাবে। তোর কি রে শালা! আমার কাছে শিবনিন্দা। বের হ এখান থেকে।"

সে উঠে গেলে ঠাকুর সে স্থান গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ফেললেন।

আমি একদিন স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হাঁ হে, তুমি কখনও বেশ্যাবাড়ীতে গিয়েছিলে ?" স্বামিজী উত্তর দিলেন, "হাঁ, বাবার মৃত্যুর পরে আমাদের অবস্থা যখন খুব খারাপ, এবং নানা দুশ্চিন্তায় মন অবসন্ন, তখন কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ দিলে, মদ খেলে আর ওসব যন্ত্রণা থাকবে না। চল, বেশ্যাবাড়ী। তাদের সঙ্গে গিয়ে একবার একটু মদ খেলুম। তখন বিভোর হয়ে লেকচার দিতে লাগলুম, 'তোদের পরকালে কি হবে' ইত্যাদি বলে! তখন সঙ্গীরা দেখলে, আমি থাকলে তাদের রসভঙ্গ হয়! তাই আমায় তাড়িয়ে দিলে। আমি রাস্তায় টলতে টলতে বাড়ী চলে এলুম।

আমি স্বামিজীকে তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোমার কি কখনও

স্ত্রীসঙ্গ হয়েছে ?" তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন, "না, ও কখনও হয়নি।" তিনি উলটে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, তোর ?"

আমি—না।

তিনি—ঠিক ত ?

আমি—ঠিক বই কি। তোমায় বললে তুমি আর আমার কি করবে ?

ঠাকুর একজনের জিভে কি লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তার স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একদিন সে একটি পর-রক্ষিতার বাড়ীতে যায়। খানিক পরে লোকটা এসে পড়ায় সে উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলে। তার উপর আবার সে লোকটা এসে তাকে লাঠির বাড়ি মারে।

ব্রহ্মচারী নন্দ—মহারাজ, ঠাকুর নাকি আপনার জিভে কি লিখে দিয়েছিলেন এবং তাতে আপনার জ্যোতিঃদর্শন হয়েছিল ? তার পরেও নাকি আপনার কপাল থেকে জ্যোতিঃ বেরত, আর অন্ধকারে চলতে আলো লাগত না ?

স্বামী সুবোধানন্দ—ও হয়, আবার যায়। ও কিছু নয়।

ব্রহ্মচারী নন্দ—এখন ওরূপ হয় ?

স্বামী সুবোধানন্দ—না, এখন আর হয় না।

———

পনের

শ্রীম'র কথোপকথন

মাষ্টার মহাশয়ের বাটী, দ্বিতলস্থ ঠাকুরঘরের সম্মুখস্থ বারান্দা। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬শে মে সন্ধ্যাকাল। ঢাকার প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত উপস্থিত।

শ্রীম—আপনাদের ঢাকা মিশনটি কেমন চলছে ?

ভক্ত—আজ্ঞে, একরূপ ভালই।

শ্রীম—ওটি যা হয়েছে, ওতে পূর্ববঙ্গের বহু লোকের কল্যাণ হবে।

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ, বিশেষতঃ কলেরা প্রভৃতি মহামারীর সময় ঢাকা মিশন থেকে সেবকেরা গিয়ে বহু অসহায় রোগীর সেবা করেন। তাতে কলেরাদি মহামারী অল্পদিনে থেমে যায় এবং গ্রামবাসীরা উপকৃত হয়। এ ছাড়া ওখানে একটি স্কুল খোলা হয়েছে, তাতেও অনেক গরীব ছেলে পড়তে পায়।

শ্রীম—আপনার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হল, একটি গান করুন। মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধে ঢাকার ভক্ত প্রফুল্লবাবু এই গানটি * গাহিলেন—

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
ও দুটী চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা॥
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে, (ও মা) স্বপনেও তাত জানি না।
আমি অহর্নিশি দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না॥
এবার যদি মরি ও হর-সুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না॥

---

* ইহা কোন অজ্ঞাত সাধক কর্তৃক রচিত এবং ভৈরবী সুরে ও একতালায় গীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই গানটী গাহিতেন।

শ্রীম—একদিন ঠাকুর আমায় একটি গান গাইতে বলেন। তখন তিনি কাশীপুরের বাগানে থাকতেন। আমি তখন এই গানটিই গেয়েছিলাম। কিন্তু উহার একটি পদ একটু অন্য ভাবে গাওয়া হয়। গানের পর ঠাকুর সেটি সংশোধন করে দিয়ে বললেন, "গানের পদ যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই গাইতে হবে, এদিক ওদিক করতে নেই।"

ভক্ত—মহাশয়, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?

শ্রীম—এখন এক রকম ভালই চলছে। কয়েকদিন হল এক আশ্চর্য উপায়ে বুকের ধড়ফড়ানিটা কমে গেছে। আগে একবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই কষ্ট হত। এখন দুই তিন বার উঠা নামা করলেও কষ্ট হয় না।

ভক্ত—কথামৃতের বাকী অংশটা আর লেখা হল না?

শ্রীম—তাঁর ইচ্ছা না হলে ত আর হবার জো নাই। আগে কত কাজ ছিল, তার মধ্যেও চারি ভাগ 'কথামৃত' লেখবার সময় হল। আর এখন কোন কাজ নেই, শরীরও যে একেবারে খারাপ, তা নয়। তবু লেখা হচ্ছে না।

সান্ধ্য আরাত্রিক ও তদন্তে প্রসাদ বিতরণের পর দ্বিতলে আসিয়া মাষ্টার মহাশয় বসিলেন এবং পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "তখন বলছিলাম যে, এক আশ্চর্য উপায়ে আমার বুকের ধড়ফড়ানিটা সেরে গেছে। এখানেও আমি ইচ্ছা করে আসি নি। তিনি জোর করে এনেছেন। ব্যাপারটা শুনুন। আগে এখানে আমার বাড়ীর মেয়েরা ছিল। এক তলায় কোন পণ্ডিত মহাশয় সপরিবারে থাকতেন। কয়েকদিন ধরে ঘরের চালের উপর ইঁট পড়তে লাগল। তাতে মেয়েরা খুব ভয় পেয়ে আমায় এখানে আসতে বলে। কিন্তু শরীর অসুস্থ বলে আজ কাল করে আমি আসতে দেরী করি। এদিকে ইঁট পড়া থামছে না দেখে শেষে পুলিসে খবর দেওয়া গেল। পুলিস এ বিষয়ে কোন

নজর দিলে না দেখে পুলিস সাহেবের নিকট আবেদন করা হল। তখন পুলিস এসে পাশের বাড়ীতে খুব শাসালে এবং বললে, কেউ যদি এরকম করে আর ইঁট ফেলে, তার উপর গুলী করবার পর্যন্ত হুকুম আছে। কিন্তু ইঁট পড়া তবু বন্ধ হল না। শেষে মেয়েরা আমায় জিদ্ করলে, হেঁটে আসতে না পারলে পাল্কী করে আসুন। একদিন এই পণ্ডিত মশায় সাড়ে দশটায় ইস্কুলে না গিয়ে অনেক বেলায় গেলেন। তিনি আমাদের মর্টন ইন্‌স্টিটিউসনে পড়াতেন। তিনি সেদিন অনেক বেলায় গিয়ে আমাকে বললেন, "মহাশয়, আজ এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম। কোথা থেকে এই ইঁট আসে দেখবার জন্য ছাদের উপর দাঁড়িয়েছিলুম। কিছুক্ষণ পর দেখি, দোতলার একটা ঘরের ভিতর থেকে কে একটা কুলুপ সহ তালা ছুঁড়ে মারল। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে মেয়েদের জিজ্ঞেস করলাম, কে ওটা ফেলেছে। তারা বললে, "যে ঘর থেকে ওটা এসেছে, ওখানে অন্য কেউ ছিল না। ঐ তালাটা কুলুপ সহিত সেই ঘরের দরজায় ঝুলান ছিল।" এসব কথা বলতে বলতেই এক খানা ইঁট ছাদের উপর থেকে নীচে এসে পড়ল। আমি ছাদে যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেখান থেকেই ইঁটখানা এল। তখন উপরে গিয়ে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই! লোহার তালা ছুঁড়ে মেরেছে শুনে মনে হল, এ ত ভূতের কাজ নয়; কারণ ভূতে কখনও লোহা ছোঁয় না। আবার এর আগে দেখা গেছে, কেউ উঠানে থাকলে প্রথম তার সামনে একটা ছোট ইঁট পড়ত। তারপর সে ভয়ে সরে গেলে একখানা বড় ইঁট পড়ত। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, উক্ত ব্যাপারের কর্তা কারও অনিষ্ট করতে চান না। অনেক ভেবেচিন্তে কূল কিনারা পেলাম না। হঠাৎ মনে হল, নিত্য ঠাকুরসেবার কোন ত্রুটি হচ্ছে না ত? এই ভেবে মেয়েদের বললুম, তোমরা সব আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মর্টন স্কুল বাড়ীতে যাও। গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তারা ওখানে গেছে আর

আমি এখানে এসেছি। কি আশ্চর্য, এখানে এসে আমি আর পূর্ব ব্যারামের চিহ্নও দেখছি না। উপরে কতবার আনাগোনা করছি, কোন কষ্ট নাই। অথচ আগে একবার উঠলেই বুকটা ধড়াস ধড়াস করত। এ ছাড়া হাঁটপড়াও একদম বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হয়, এতদিন নিত্য ঠাকুরসেবার কোন ত্রুটি হচ্ছিল। তাই এত কাণ্ড করে আমায় তাঁর কাছে আনলেন। আসুন, সরকারী গ্যাসের আলোকে ঘরের ভিতরটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখবেন।

ষোল

রামলালদাদার কথোপকথন

বেলুড় মঠ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯শে মে। মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত। বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা স্মরণ ভক্তদের একটি বিশেষ সাধন। যাঁহার ক্ষণমাত্র দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ভক্তের হৃদয় তৃষিত-চাতকের ন্যায় ব্যাকুল থাকে, মানস নেত্রে তাঁহাকে আহারবিহারাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে দেখিলে যে আনন্দের উদ্রেক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রত্যহ এরূপ চেষ্টার ফলে মন ক্রমশঃ ধ্যানপ্রবণ ও একাগ্র হইয়া উঠে। রামকৃষ্ণভক্তদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে নাই। ঢাকার ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনন্দিন লীলা জানিবার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় রামলালদাদাকে অনুনয় করিলেন, "দাদা, ঠাকুর সকালে ঘুম থেকে উঠে কি করে সারা দিন কাটাতেন, অনুগ্রহ করে বলুন। তাঁকে দর্শন করা এবং তাঁর কাছে থাকা ত আমাদের ভাগ্যে ঘটে নি। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবদের মত তাঁর লীলা স্মরণ করতে ইচ্ছা হয়। তাঁর একদিনের কার্যকলাপ বললেই মোটামুটি বোঝা যাবে।"

রামলালদাদা—তিনি রোজ রাত প্রায় ৩'৩া৽টার সময় উঠতেন। তিনি খাট থেকে নাবতে না নাবতেই আমি জেগে উঠতুম। বলতুম, 'কি, উঠলেন ?'

ঠাকুর—হুঁ। মুতব। তখন পশ্চিমের গোলবারান্দার দক্ষিণ ধারে বসে তিনি প্রস্রাব করতেন।

আমি—বাহ্যে যাবেন ? হাত দিয়ে পেট চাপড়ে ঠাকুর বলতেন, "হুঁ"। তখন আমি লণ্ঠন, গাড়ু ও গামছা নিয়ে কখনও বা আগে কখনও বা পিছু পিছু ঝাউতলার দিকে চলতুম। বাহ্যে করে এক গাড়ু জল দিয়ে তিনি শৌচ করতেন ; আর এক গাড়ু জল এনে দিলে হাত মাটি করতেন। তারপর হাঁসপুকুরের দক্ষিণ সিঁড়ির চাতালে বসবার স্থানে পা ঝুলিয়ে বসে কাপড়টা খুলে ফেলে দিতেন। আমি গাড়ু মেজে জল এনে দিলে হাত পা মুখ ধুয়ে ঘরের দিকে চলতেন। আমি তাড়াতাড়ি আবার গাড়ু মেজে কাপড় ধুয়ে তাঁর সঙ্গে ঘরে যেতুম। তখন তিনি কাপড় ছেড়ে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁতন করতে বসতেন। আমি দাঁতনকাঠির আগাটা চৌকাঠের উপর রেখে নুড়ি দিয়ে থেত্‌লে দিলে তিনি দাঁতন করতেন। দাঁত মাজা হলে কাঠিটা ছুরি দিয়ে চিরে দিলে তাই দিয়ে জিভ ছুলতেন। তারপর গঙ্গাজল হাতে নিয়ে মাথায় ছিটাতে ছিটাতে বলতেন, "ব্রহ্মবারি, ব্রহ্মবারি, গঙ্গা, গঙ্গা। হরি ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি" তখন ঘরে এসে পশ্চিমের দেয়ালে (যেখানে সরস্বতীর ছবি রয়েছে) পেরেকে ঝোলান বেটুয়া থেকে জগন্নাথের আটকে, মা কালীর প্রসাদ ও তারকেশ্বরের বিল্বপত্র একটু একটু মুখে দিতেন। তার পর হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে ঘরের সব ছবি একে একে প্রণাম করে ছোট খাটটিতে বসতেন ও ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন।

এক গাড়ু জল দিয়ে জলশৌচের ব্যাপার দেখেই বুঝতুম, সেদিন

বড় শুচিভাব। সবই এরূপভাবে চলবে। আবার কোন দিন এক গাড়ু জল দিয়ে জলশৌচ, হাতমাটি, মুখ ধোয়া পর্যন্ত সেরে কাপড় অর্ধেক মাথায় জড়িয়ে এবং অর্ধেক বগলে গুঁজে ঘরে যেতেন। ঘরে গিয়েই বলতেন, "ওরে আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে। কি আছে শীগ্‌গির দে।" তখন ছোট খাটটিতে বসে যা হয় কিছু খেয়ে মাথায় কাপড়ে হাত মুছতেন। আর কাপড় ছাড়া হত না। ঐ সব দেখেই বুঝতুম, সেদিন ঐরূপেই চলবে।

একদিন ঝাউগাছগুলির পশ্চিমে কুলগাছতলায় তিনি বাহ্যে করতে বসেছিলেন। তখন একটা পাকা কুল টুপ্‌ করে তাঁর সামনে পড়ল। উনিও অমনি ঐটে মুখে পুরে খেয়ে আঁঠিটা ফেলে দিলেন। তখন আবার আমায় বলা হল, "ওরে আমার কি হল বল দেখিন্! হাগা পোদে কুলটা খেয়ে ফেললুম। কি জানিস্? মা আমায় কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদবৎ, কখন বা পিশাচবৎ রাখেন। এখন পিশাচবৎ।" তার পর ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেলে ৯।১০টার সময় তাঁকে তেল মাখিয়ে দিতুম। আগে সমস্ত গায়ে, হাতে ও পায়ে তেল মাখিয়ে জিজ্ঞেস করতুম, মাথায় তেল দেব কি? দিতে বললে তখন মাথায় তেল মাখিয়ে দিতুম। এর আগে একদিন গায়ে তেল মাখিয়ে যেমনি তেল নিয়ে মাথায় হাত দিয়েছি অমনি রেগে চোখ লাল করে বললেন, "শালা!" এই বলে আমায় মারতে উঠলেন। আর সেই অবস্থাতেই সমাধিস্থ হলেন। আমি ত ব্যাপার দেখে অবাক্। ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হলেন। তখন বললেন, "দেখ, যখন তখন আমার মাথায় হাত দিস্‌নি। আমি কখন কি ভাবে থাকি তার কি ঠিক আছে? গায়ে তেল মাখিয়ে মাথায় দেবার আগে আমায় জিগ্যেস করবি।"

আর একদিন তাঁর মাথায় একটা সুতো পড়েছিল দেখে আমি ওটা

ফেলে দিতে যেই মাথায় হাত দিলাম, অমনি রেগে বল্লেন, "শালা, আবার মাথায় হাত ?" আমি ওকথা ভুলেই গিয়েছিলুম। এইরূপে তেল মাখা হলে বড় ঘাটে নেয়ে কালীঘরে যেতেন। সেখানে কোন দিন বা মাকে সাজাতেন, আবার কোন দিন বা ফুলবেলপাতা একসঙ্গে মার পায়ে দিতেন অথবা নিজের মাথায় ফুল দিয়ে সমাধিস্থ হতেন।

সতের

লক্ষ্মী দিদির কথোপকথন

দক্ষিণেশ্বর, রাণী রাসমণির কালীবাড়ী। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই নভেম্বর। ব্রহ্মচারী ভবানী প্রাতে বেলুড় মঠ হইতে ঢাকার ভক্ত প্রফুল্ল বাবুর সহিত কালীবাড়ীতে আসিয়াছেন, ঠাকুরের লীলাস্থলে দুই চার দিন অবস্থান ও অনুধ্যানের উদ্দেশ্যে। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দিদি সেই সময় তাঁহার ছেলেমেয়েদের লইয়া কালীবাড়ীর কিয়ৎ দূরে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রোজ সকাল বেলা গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহমার্জনপূর্ব্বক বিছানাটি পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া যাইতেন। ঠাকুর যখন কালীবাড়ীতে থাকিতেন তখন লক্ষ্মী দিদির বয়স ১০।১২ বৎসর ছিল। সেই সময় লক্ষ্মী দিদি শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর সহিত দীর্ঘ কাল নহবৎখানায় বাস করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, শীতলার অংশে লক্ষ্মীদিদির জন্ম। ঢাকার ভক্ত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি সেই কালের কথা বলিতে লাগিলেন।—

লক্ষ্মীদিদি—আমরা ঐ নহবত খানায় থাকতুম। খুড়ীমা ও আমাকে ঠাকুর 'শুক-সারী' বলতেন। বাস্তবিক শুক-সারীরই মত আমরা ঐ খাঁচা-তুল্য ছোট ঘরটিতে থাকতুম। তাঁর কাছে যে সব লোক আসত তাদের খুব কম লোকই জানত যে, আমরা ওখানে আছি। বেলা ১০।১১টার সময় যখন

ভক্তরা তাঁর কাছে বসত তখন তিনি খুড়ো মহাশয়কে বলতেন, "ওরে শুক-সারীকে ছোলা ভিজে খেতে দিয়েছিস্?" মাষ্টার মহাশয় ঐ পূর্বদক্ষিণ কোণে বসে পেন্সিল দিয়ে খাতায় লিখতেন। তিনি একদিন বলেছিলেন, "আমি ভাবতুম সত্যি বুঝি তিনি শুক-সারী পুষেছেন, আর তাদের খাওয়াবার কথা বললেন।" খুড়ীমা এবং আমাকে তিনি রামায়ণ ও মহাভারত থেকে নলরাজার গল্প এবং আরও সব উপাখ্যান বলে শোনাতেন। আবার আমরা বুঝলুম কিনা তাই বার বার জিজ্ঞাসা করে পরীক্ষা করতেন। আমার মুখে গল্প শুনে বলতেন, "সাধে কি তোরে শুক বলি?" আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনি প্রায়ই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একথা বলেন! এর মানে কি?" তিনি বল্লেন, যেমন তোকে আমি এসব বলছি, এটা বর্ত্তমান। তুই নহবতে গিয়ে তোর খুড়ীকে বলবি, 'তিনি বল্লেন', আমি মরলে বলবি, 'তিনি বলেছিলেন,' এটা ভূত। আবার 'তিনি বলবেন', এটা ভবিষ্যৎ। এই রকম।

আগে সরকারী ভোগ নহবতে যেত, নহবতে রান্না হত না। তার পর খুড়ীমাকে দিয়ে তিনি রান্না করাবার কথা বলায় হৃদু বলেছিল, "ওখানে স্থান কোথা, অতটুকু জায়গা; কাঠে হাঁড়িতে ভরে যাবে।" তাতে ঠাকুর বলেছিলেন, "ওরে জানিস্ নি, দুটো ছুকরি নিষ্কর্মা থাকলে বেড়া ফাঁক করে লোক দেখবে, আর কোন দিন···"। হৃদু রাগ করে বললে, "কি যা তা বলছেন। ওরা ভাল মানুষ। চলুন বেড়িয়ে আসি।" তিনি বললেন, "না রে, ও জাতকে বিশ্বাস করতে নেই। দেখিস···।" তার পর তিনি আমায় বলেছিলেন, "দেখ, মেয়েদের রান্না করাই নিয়ম। পূর্বকালে রাণীরা রেঁধে দিতেন এবং রাজারা খেতেন। গল্পে শুনিস্ নি? যদি বলিস ওসব মিথ্যে কথা, তা নয়। কারণ ভাগবতে আছে, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ খাচ্ছেন, রুক্মিণী সামনে বসে আছেন। হঠাৎ এদিকে বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী কাতর হয়ে ঠাকুরকে ডাকছেন, আর

ঠাকুর কৃষ্ণ না খেয়েই তখন দৌড়ালেন। তখন রুক্মিণী কেঁদে নারদকে বলছেন, "হায়, আমি কি পাপ করেছি যে, আজ আমার হাতের রান্না ঠাকুরের ভোগে লাগল না।" যাঁর ঘরে সোণার দেওয়াল ছিল, তিনি কি রাঁধুনী বামুন রাখতে পারতেন না? আর আজকাল শালারা ত্রিশ টাকা মাইনে পেয়েই মাগ নিয়ে মা বাপ ছেড়ে পালায়, আর বামুন রেখে দেয়। আর শালীরাও শালাদের পোঁদের ছেঁড়া কাপড় পরে ভাবে, কি হলুম রে! তাই বলি, রান্নায় ব্যস্ত থাকলে তাদের মনও ভাল থাকবে। রান্নাই মেয়েদের লক্ষ্মী করে।"

এক রাত্রে শ্রীমতীর ভাবে ভাবিত হয়ে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে কুঞ্জে যাচ্ছেন ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে গোলাপবাগানে ঢুকে পড়েছেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য, গা কাঁটায় আঁচড়ে গেছে। গোলাপ গাছের ডালে কাপড় আটকে গিয়ে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর পাহারাওয়ালারা তাঁকে এ অবস্থায় দেখে ডাকাডাকি করে আমাদের তুললে। আমি তাড়াতাড়ি খাজাঞ্চিকে ডাকলুম। তখন অনেক লোক জমে গেল। খুড়ীমা সেখানে এসে কেঁদে ফেললেন। এর আগে তাঁকে কেউ বাইরে দেখে নি। তারপর ধরাধরি করে ঠাকুরকে ঘরে আনা হলে তিনি বললেন, "আমি কুঞ্জবনে যাচ্ছি। তোরা কেন আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছিস? আমায় ছেড়ে দে।" এর পর খাজাঞ্চির কথায় আমরা দুজনে তাঁর ঘরে শুতুম। খুড়ীমা একটা মোটা কাপড় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন। দুই তিন দিন পর ঠাকুর অনেক রাত্রে বলছেন, "দেখ বাছা, তোমরা কেন এত কষ্ট পাচ্ছ? এই গরম! এতে তোমাদের হয়ত ইচ্ছে হয় গা খুলে শুতে। তাই বাছা তোমরা ওখানে গিয়ে শোও।" তখন আমরা নহবতে গেলুম। এর আগেই হৃদু বরখাস্ত হয়ে ওখান থেকে চলে গিয়েছিল।

এর কয়েকদিন পর রামবাবুর ছেলেপিলে নিয়ে লাটু এল। কয়েকদিন আসা যাওয়ার পরই সে বললে, "হামি না যাব।" লাটুকে

ও আমাকে ঠাকুর যথাক্রমে লেখাপড়া ও গান শেখাতেন। লাটুকে তিনি বলতেন, "বল ক।" লাটু বলত "কা"। ঠাকুর বলতেন, "বল খ"। লাটু বলত "খা"। ঠাকুর তখন বিরক্ত হয়ে বলতেন, "দূর শালা। তোর লেখাপড়া হবে না।" তিনি খুড়ীমাকে বলেছিলেন, "জয়রামবাটীর কথা ভাবা এবং সেখান থেকে যারা আসে, তাদের সঙ্গে কথা বলাই তোমার উপাসনা।" সেখানকার কেউ এলে তিনি বলতেন, "ঐ তোমার উপাসনা এসেছে। জয়রামবাটীই তোমাকে খাবে।" আমি ওবার পূজার সময় বেলুড়ে গেলে খুড়ীমা বলেছিলেন, "দেখ, শেষ বয়সে আমি এখন কী যন্ত্রণায় পড়েছি। চিরকাল তোর সঙ্গে রইলুম, শেষে ঠাকুর ছাড়িয়ে দিলেন। তোর কাছে তাঁর কত কথা শুনতুম!" এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। গোলাপ মা জল খেতে ডাকলে খুড়ীমা বলতেন, "দাঁড়াও, আগে পেট খালি করে নি।" একদিন কথায় কথায় বলছিলাম, "সংসারে থাকতে আর ভাল লাগছে না; এবার গেলে আর আসছি না।"

ঠাকুর—"কেন? বৈকুণ্ঠে অনেক দিন থাকলে আর ভাল লাগবে না। তখন আবার আসতে ইচ্ছা হবে।"

আমি—"আমার খুব ভাল লাগবে। কেটে কুচি কুচি করলেও আর আসবো না।"

ঠাকুর—আসবি বৈ কি? আমার সঙ্গেই আবার আসবি। এবার তবু ঘরের তলায় আছি। আবার যখন আসবো তখন গাছের তলায় তলায় ফিরবো। আমি ভিক্ষে করে আনবো, তোর খুড়ীর কাঁধের ভারের এক পাশে মেটে হাঁড়ি, অন্য পাশে পাথরের ডালা থাকবে। তুই শাক পাতা কুড়িয়ে আনবি, আর তোর খুড়ীমা সেই মেটে পাত্রে রাঁধবে। তারপর খেয়ে দেয়ে আবার অন্য গাছতলায় আড্ডা করবো।"

এক বৎসর দোল পূর্ণিমার রাত্রে বলরাম বাবুর মেয়েরা গৌরী মার

সঙ্গে লুকিয়ে এখানে এসেছিল। গৌরী মাকে দিয়ে সমস্ত দিন খাবার-টাবার আনিয়েছেন। রাত্রে কর্তাদের ঘুম এলে গৌরী মা এক এক জন করে পেছনের দেওয়াল টপ্‌কে বাড়ীর বাহিরে এনেছেন। তার পর সবাই হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। সমস্ত রাত ঠাকুরের কাছে ও নহবতে খুড়ীমার সঙ্গে তাঁরা আনন্দে কাটালেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "ত্মাখ্, গোপিনীরা এমনি করে কৃষ্ণদর্শনে যেত।" শেষ রাত্রে তারা আবার হেঁটে রওয়ানা হলে মহা ঝড়-বৃষ্টি এলো। ঠাকুর তখন ছটফট করতে লাগলেন এবং বললেন, "ঐ এতক্ষণে ওরা হয়ত রাস্তায় মরে পড়ে আছে।" খুব সকালে যোগেনকে বলছেন, "দেখে আয় ত, তারা কোথায় মরে পড়ে আছে?" বাবুরা ঘুম থেকে উঠেই দেখেন, যোগেন হাজির। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, এত ভোরে?" সে বলল, "এই আপনাদের দেখতে এলাম!" মেয়েরা, যেন কিছু জানেন না—এই ভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, "কি যোগেন, এত সকালে কোথা থেকে এলে? ঠাকুর কেমন আছেন?"

আঠার

স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপদেশ

(১)

সানফ্রান্সিস্কো সহরে যে হিন্দু মন্দির বিদ্যমান তাহা আধুনিক যুগে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রথম হিন্দু দেবালয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীত। স্বামী ত্রিগুণাতীত ১৯০২—১৯০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সানফ্রান্সিস্কো সহরে বেদান্ত প্রচারান্তে তথায় দেহত্যাগ করেন। ১৯১০ খ্রীঃ তাঁহার সহিত কোন বিশিষ্ট মার্কিন দর্শকের যে সাক্ষাৎ হয় তাহা সানফ্রান্সিস্কোর 'দি ইভনিং

পোষ্ট' (The Evening Post) এ প্রকাশিত হয়। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯১০ খ্রীঃ এপ্রিল সংখ্যায় উক্ত বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়।

উপরোক্ত বিশিষ্ট দর্শক হিন্দু মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলে স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রাচ্য প্রথায় বরেণ্য অতিথিকে অভ্যর্থনাপূর্বক প্রাথমিক পরিচয়ান্তে সহাস্যে বলিলেন, "আমাদের অভ্যর্থনা আধ্যাত্মিক, আমাদের হৃদ্যতাও আধ্যাত্মিক। আমি আপনাকে সেই ঈশ্বরের সন্তানরূপে দেখি, যিনি আমারও পিতা, স্রষ্টা। আপনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা অনুভব-পূর্বক গভীর প্রীতিভরে আপনাকে অভ্যর্থনা করি এবং আমার হৃদয় দ্বার আপনার কাছে উন্মুক্ত রাখি।" স্বামী ত্রিগুণাতীতের সুভদ্রতায় ও সুশিষ্টতায় দর্শক মুগ্ধ হইলেন এবং বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলেন। তখন স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহার সমুজ্জ্বল নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "বেদান্ত কোন শাস্ত্র বা সংহিতা নয়, কোন ধর্ম বা দর্শন নয়। ইহাতে সর্ব দর্শনের ও সর্ব বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত। বেদান্ত সনাতন, অপৌরুষেয়। ইহাতে মানবের দিব্যস্বরূপ প্রকটিত। প্রকৃত বেদান্তী নিজের মধ্যে এবং সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন।"

স্বামী ত্রিগুণাতীত মার্কিণ সমাজে ব্যবসায় জীবনের প্রভাব সমালোচনা পূর্বক কহিলেন, "এই সমৃদ্ধ সুন্দর দেশের যে দিকে চক্ষু ফিরাই সেদিকেই দেখি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম পদের নরনারীসমূহ অতিশ্রম, অবিশ্রাম, দুশ্চিন্তা, ব্যগ্রতা ও ব্যস্ততার ভারে উৎপীড়িত। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোক উচ্চতর শ্রেণীর লোকের মত অর্থশালী হইবার জন্য উন্মত্ত। সমাজের কেহই সুখী নহে, সন্তুষ্ট নহে। অধিকতর সম্পদ ও ভোগের বাসনায় প্রত্যেকের সকল উৎসাহ নিঃশেষিত। তাই কাহারও মনে সাম্যভাব বা সুশান্তি নাই এবং প্রত্যেকেই জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্মৃত। ইহাই আধুনিক সভ্যতার অন্যতম দোষ। প্রকৃত সভ্যতা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসারে আন্তর প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনে

নিযুক্ত হইবে। ঐহিক জীবনের কোলাহল শান্ত না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের অনাহত আহ্বান শ্রুতিগোচর হয় না। জীবন যতই বহির্মুখ হয় ততই অভাব অভিযোগ বাড়ে।.

"মিশনারীরা এদেশ ও ইউরোপ থেকে ভারতে গিয়ে একটা জটিল জীবনের আদর্শ দেখায় এবং সেটাকে ধর্মের অঙ্গীভূত মনে করে। তারা ভুলে যায় যে, খ্রীস্ট একজন প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষ ছিলেন এবং প্রাচ্যের সকল ধর্মগুরুর ন্যায় সহজ সরল জীবন যাপন করিয়াছিলেন। যে স্বর্গীয় পিতা খেচরদের আহার জোগান তাঁহার উপরই খ্রীস্ট সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। ভারতের তথা-কথিত মূর্তি-পূজকদের মধ্যে খ্রীস্টের বহু প্রকৃত শিষ্য দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যের তথা-কথিত খ্রীস্টানদের মধ্যে ক্রাইস্টের যথার্থ পদানুগ ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়।"

হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখে যীশুর মহিমা শুনিয়া মার্কিন দর্শক স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বর্তমান সমস্যার সমাধান এবং সরল জীবনের কথা শুনিতে চাহিলে স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, "সরল জীবন বলিতে সংসার ত্যাগ এবং গহন বনে বা পর্বত-গুহায় বাস বুঝায় না। যে অলঙ্ঘ্য নৈতিক নিয়ম দ্বারা জড়-জগৎ ও মনোজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করাই সরল জীবন যাপনের উদ্দেশ্য। যখন জীবনে নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয় তখনই জীবনে বিশৃঙ্খলা আসে, জটিলতা বাড়ে এবং রোগ, পাপ, মোহ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব, ও কামকাঞ্চনের আরাধনা প্রবল হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ বা পানাহারের অল্পতা দ্বারাই জীবন সরল হয় না। সরলতার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসংযম ও নীতি-নিষ্ঠা। বহু সাধনার ফলে সেই সরলতা লাভ হয়। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত আত্মবিকাশ বা জীবনোৎকর্ষ অসম্ভব। সরল মানুষ নিঃস্বার্থ, প্রেমিক ও সেবাপরায়ণ হয়। সম্পূর্ণ সরলতাই আসল সন্ন্যাস।".

স্বামী ত্রিগুণাতীতের অতিশয় উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মভাব দেখিয়া

দর্শকটি বেদান্ত ও খ্রীষ্ট-বাণীর মধ্যে সাদৃশ্য জানিতে চাহিলে ত্রিগুণাতীত মহারাজ বলিলেন, "খ্রীস্টকে আমরা বেদান্তের অন্যতম আচার্যরূপে পূজা করি। মানব জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য জগতে যুগে যুগে যে সকল দেবমানব মহাপুরুষ আবির্ভূত হন যীশু তাঁহাদের মধ্যে একজন। খ্রীষ্টবাণীতে বেদান্তের ক্ষীণালোক দেখা যায়। বেদান্তকে সর্বধর্মের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। খ্রীস্টের বাণী "স্বর্গ-রাজ্য তোমার মধ্যে বিদ্যমান" বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। উক্ত বাণীর বিশদার্থ বেদান্তে পাওয়া যায়। স্বহৃদয়ে এবং সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনকেই খ্রীস্ট উক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন। যখন ঈশ্বর দর্শন হয় তখন জীবন ও জগৎ স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়, স্বর্গসুখ স্বহৃদয়ে প্রতিক্ষণে অনুভূত হয়।"

(২)

স্বামী ত্রিগুণাতীত "মায়ের খেলার রহস্য" (Mystery of Mother's Play) সম্বন্ধে যে বক্তৃতা আমেরিকায় দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার ১৯২৫, অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"প্রকৃতি মাতার কৃপা প্রার্থনা এবং তাঁহার নির্দেশে জীবনযাপন ব্যতীত সত্যলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা আর নাই। কোন্ জীবন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট? আমরা যে জীবন যাপন করি তাহা কি সন্তোষজনক? নিশ্চয়ই নয়। কারণ এখানে আমরা অনন্ত অজ্ঞানে বাস করি, আমরা এখানে সর্বদা নিবিড় অন্ধকারে থাকি। আমাদের জীবন-প্রহেলিকা ভেদ করতে হবে, মায়ের খেলার রহস্য বুঝতে হবে। পশুদের মত আমরা পানাহার নিয়ে জীবন কাটাতে পারি না। যখন আমাদের বিবেক জাগবে তখন দেখব যে, সত্য ও সুখ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত। রহস্য-ভেদ হলেই সত্যদর্শন হয়। কিন্তু অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন করা খুবই কঠিন। মায়ের কৃপা ব্যতীত এই আবরণ ছিন্ন করা যায় না। জাগতিক আকর্ষণ

এত প্রবল যে, আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ সহজে বিস্মৃত হই। যে ক্ষণে সত্যলাভের ইচ্ছা জাগে, তৎপরক্ষণেই তা ভুলে যাই। সত্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা যতই জীবনে ব্যাপক ও স্থায়ী হবে ততই সত্যের স্বরূপ আমরা অনুভব করব।

"মায়ার প্রভাবে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যাই। মায়ার প্রভাবে আমরা পৃথিবীতে দেহধারণ করি এবং ইন্দ্রিয়াধীন জীবন যাপন করি। এ সবই মায়ের খেলা। মাকে ডাকলে তাঁর খেলার রহস্য জানা যায়। মা প্রসন্না হলে অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হয়। আচার্যগণ বলেছেন, এই জীবনেই আমরা সত্যলাভ বা ঈশ্বরদর্শন করতে পারি। মা-ই মানব জীবনের মূলীভূত সত্তা। আমরা মায়ের ইচ্ছায় সব কিছু করি, আমরা মায়ের হাতের পুতুল মাত্র। এইটি জানলেই জীবনের রহস্য-ভেদ হবে, শ্রেয় লাভ হবে।' মা অন্তরে বাহিরে লুকায়িতা থেকে আমাদের চালাচ্ছেন। আমরা তাঁর জন্য কাঁদলে তিনি দেখা দেন। দেহ-মন, হস্ত-পদ, বুদ্ধি প্রভৃতি যা তিনি দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করলে মাকে জানা যায়। যখন আমরা মায়ের জন্য অস্থির হব তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের দেখা দেবেন। জাগতিক আসক্তি ও বিমোহ যখন দূর হবে তখনই মায়ের চিন্তা করতে ইচ্ছা হবে। নানা বাসনা-কামনা মনে জাগিয়ে দিয়ে মা আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন। আমরা যখন বাসনা-কামনা দূরে ফেলে দিয়ে মাকে ডাকব, এবং মা ছাড়া যখন আর থাকতে পারব না, তখন তিনি এসে নিশ্চয়ই দেখা দেবেন। মাকে দেখবার কামনাটি এত প্রবল করতে হবে যে, অন্য বাসনা তখন আর মনে স্থান পাবে না।। মাকে পাবার জন্য যতই আমরা ব্যাকুল হব ততই তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে আসবেন। আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে আমরা মেতে আছি বলেই মা দূরে থাকেন। আমরা স্থূল জগৎকে ও স্থূল দেহকে অত্যন্ত ভালবাসি বলেই মাকে জানবার ইচ্ছা হয় না।

'জাগতিক বিষয় ও ব্যক্তি থেকে মন তুলে এনে যখন আত্মস্থ হব তখনই মায়ের কথা মনে পড়বে। মাকে ডাকা বা স্মরণ করাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জগৎকে ভুলতে না পারলে মাকে পাওয়া যায় না। যখন আমাদের দৃষ্টি জগতে নিবদ্ধ হয় তখন মাকে দেখতে পাই না। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে জগৎকে ভুলে গিয়ে মাকে চিন্তা করি। আমাদের সকল চিন্তা যেন মাতৃমুখী হয়। আমাদের সকল চিন্তা ও শক্তি যেন মাতৃচিন্তায় নিয়োজিত হয়। যখন তা হবে তখন আমরা মায়ের খেলার রহস্য বুঝতে পারব। তখন আমাদের সর্বদুঃখ নিবৃত্ত হবে এবং আমরা চিরশান্তির অধিকারী হব।".

(৩)

স্বামী ত্রিগুণাতীতের দুইখানি পত্রের সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। পত্রদ্বয় কোন ভক্তকে লিখিত এবং "উদ্বোধন" পত্রিকার ১৩৪৮, চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম পত্রটী আমেরিকা যাইবার পথে কলম্বো হইতে ১৯০২ খ্রীঃ ৯ই নভেম্বর তারিখে লিখিত। উক্ত পত্রে আছে, "এবারকার পত্রে যথার্থই মনের কথা লিখেছেন, সন্দেহ নাই। বয়েস বাড়ছে, কন্যাপুত্রাদির বন্ধন বাড়ছে; কিন্তু সেরকম প্রবল ইচ্ছা নেই বলে কি হাল ছেড়ে দেবেন? তা কখনই উচিত নয়। সেই শেষ শ্বাস পর্যন্ত যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনই আশা ভরসা ছেড়ে দেবেন না, খবরদার! সমুদ্রে নৌকা ডুবছে, তখনও কি মাঝি হাল ছেড়ে দিয়ে থাকে? কি জানি, যদি পাওয়া যায়। জীবনের শেষ পর্যন্ত মাকে ডাকতে ডাকতে যদি একটা ডাকও হঠাৎ সেই রকম ডাকের মতন ডাক হয়ে পড়ে, তা হলেই তো আর কি, কেল্লা ফতে! তাই বলি, ঢেউ দেখে সংসারের হাজার তুফান উঠলেও বা মনের হাজার দৌর্বল্য এলেও কখনও হালটি ছাড়বেন না, কখনও মাকে ডাকতে ভুলবেন না—তা তোতাপাখীর মত মুখের বাহ্যিক ডাকাই হোক, আর সরল ভক্তের মত আন্তরিক ডাকাই হোক। একটা

নিয়ম করবেন যে, রোজ এত করে নিশ্চয়ই জপ করব, এতটা জপ না করে ভাত খাবই না। এই রকমের কতকগুলি নিয়ম বেঁধে মনকে তৈরী করুন। অনেকে তো অনেক বিদ্যা শেখে, অনেক রকমের কাণ্ড বা কৌশল শেখে। আপনি না হয় একটা সখের জন্য বা খাতিরে পড়ে একটা নূতন কিছু (মনের সঙ্গে লড়াই করা বিদ্যা) শিখলেন। এই রকম বাহ্যিক নিয়ম বেঁধে কাজ করতে করতেই অন্তরে প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হতে থাকে। আপনি এক বছর, যে রকম বলি, ঠিক ঠিক সেই রকম নিয়ম বেঁধে জপ ধ্যান করতে থাকুন তো। দেখি, কেমন আপনার ভিতরে প্রবল ইচ্ছা না আসে। আপনার পূর্বজন্মের সুকৃতি অল্পস্বল্প আছে বেশ জানবেন। একেবারে কিছু নেই তা আদৌ মনে করবেন না। আর মহাত্মাদের কৃপার কথা লিখেছেন। মহাত্মাদের কৃপার খেই নেই, স্বয়ং ভগবানের কৃপা আসবে, আমি যা বলি তাই করুন দিকি।

এ সকল দেশে স্বামীজীর নামে সব উন্মত্ত হয়ে ওঠে, এরা স্বামীজীকে এত ভক্তি করে। আমার তো প্রায় আহার-নিদ্রা এক রকম বন্ধ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এত হুদো হুদো লোক আসছে!"

দ্বিতীয় পত্রখানি আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেস শহর হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ ১৩ই মে লিখিত। ইহাতে আছে, "আপনি জপ ধ্যান নিয়মমত করিতেছেন জানিয়া যারপর নাই খুসী হইলাম। ঠাকুরের জন্মোৎসবাদিতে গিয়াছিলেন শুনিয়া আরো আনন্দিত হইয়াছি। এযুগে ঠাকুর ছাড়া পথ নাই। তিনি বল, বুদ্ধি, ভরসা সবই। তাঁকে কোন মতেই ছাড়িবেন না। জপ ধ্যান করিতে কষ্টবোধ হইলেও বন্ধ করিবেন না। তাঁকে খুব পাকড়াইয়া ধরিবেন। খুঁটী ছাড়িলেই পড়িয়া যাইবেন, খবরদার তাঁকে ছাড়িবেন না।...আমি আজকাল কেবল দুধ খাইয়া আছি। দিনরাত্রে মাত্র দেড় সের দুধ খাই। বেশ আছি। তবে শরীর যেমন খারাপ থাকে তেমনি আছে। ঠাকুরের কার্য করিতেছি বলিয়া আজও পড়ি নাই। শরীর খারাপ হলেও যুঝতে পারছি।"

হরি ওঁ তৎ সৎ

সমাপ্ত